৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৭

টপিক:

নির্বাহী বিভাগ- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, স্থানীয় সরকার (পার্বত্য স্থানীয় সরকারসহ), স্থানীয় সরকার নির্বাচন ২০২০-২১, কেন্দ্রীয় মাঠ প্রশাসন ইত্যাদি।
আইন বিভাগ- আইন প্রণয়ন, সংসদে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিধান, আইন বিভাগ - আর্থিক ও তত্ত্বাবধায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি, সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি ।
বিচার বিভাগ: সংসদ সচিবালয়, সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, গ্রাম আদালত ADR.

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

নির্বাহী বিভাগ

❑ রাষ্ট্রপতি

শাসন বিভাগের কার্যক্রম মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু থাকায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত অর্থে নামমাত্র শাসক। রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। তবে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা। এই সংসদই যেকোনো বড় ধরনের ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্রপতি মূলতঃ আলংকারিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংসদীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

নির্বাহী বিভাগ

❑ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রধান। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮-৫৪ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সংবিধান ও আইন বলে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। যদিও রাষ্ট্রের সকল কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়, মূল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে কতিপয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নিম্নে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

নির্বাহী বিভাগ

❑ সরকার প্রধানের নিয়োগ ও শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী রাজনৈতিক দলের বা জোটের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ প্রদান করেন। [অনু.৫৬(৩)] অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তাঁর পছন্দের ব্যক্তিদেরকে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। [অনু.৫৫ ও ৫৬] এছাড়াও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারগণকে নিয়োগ প্রদান করেন।

❑ জরুরি ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, সে ক্ষেত্রে তিনি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরি অবস্থাকালে সংবিধান প্রদত্ত জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত থাকে। [অনু.১৪১(ক)]

নির্বাহী বিভাগ

❑ অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা

বিলুপ্ত অথবা ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় অথবা সংসদের অধিবেশনকাল ব্যতীত কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান মনে হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন। [অনু.৯৩]

❑ প্রতিরক্ষা বিষয়ক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক। [অনু.৬১] রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংসদের অনুমতি সাপেক্ষে এবং জরুরি অবস্থায় নিজ এখতিয়ার বলে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন।

❑ ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা

কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো ধরনের দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে। [অনু.৪৯]

❑ রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিশেষ দায়মুক্তি লাভ করেন। দায়মুক্তি সমূহ হচ্ছে-

(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

(খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

❑ রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ও অপসারণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে তিনি অভিশংসিত হতে পারেন। দুইভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ হারাতে পারেন। একটি হচ্ছে, অভিশংসন (৫২ অনুচ্ছেদ) ও অন্যটি অপসারণ (৫৩ অনুচ্ছেদ)।

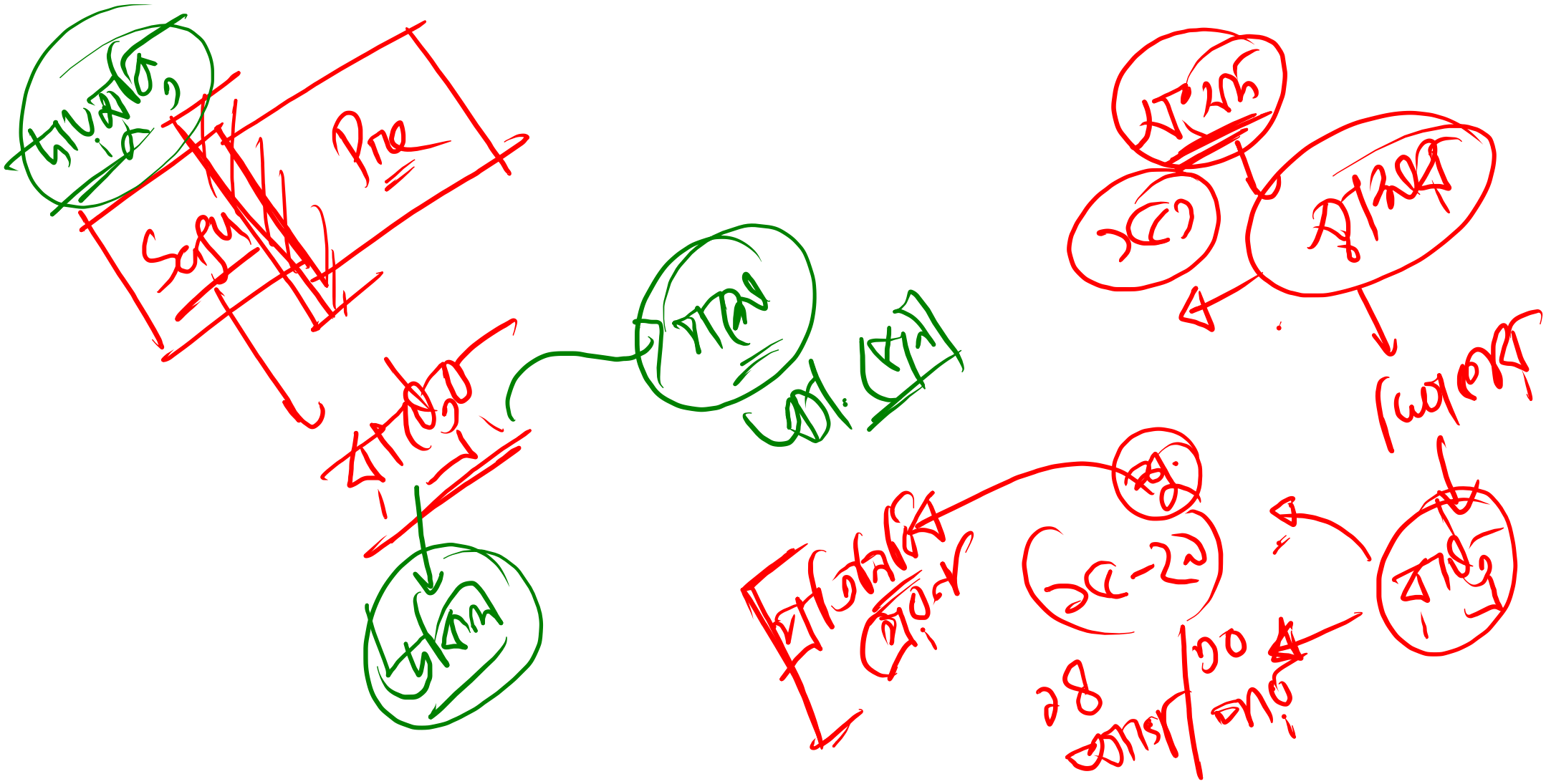

❑ অভিশংসন প্রক্রিয়া

রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অভিশংসনের সময় একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ধাপসমূহ হচ্ছে-

(ক) সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের কাছে প্রদান করতে হবে; স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন থেকে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

(খ) কোনো অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।

(গ) অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।

(ঘ) অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

অপসারণের প্রক্রিয়া

শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের সময় একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ধাপসমূহ হচ্ছে-

(ক) সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে।

(খ) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পিকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর স্পিকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন এবং তার সাথে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হন।

(গ) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদানের পর হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হলে স্পিকার সংসদ আহ্বান করবেন।

(ঘ) প্রস্তাবটি বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।

(ঙ) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য উপস্থিত না হয়ে থাকলে প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তা গৃহীত হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(চ) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হবার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাবে না।

(ছ) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হলে তা বিবেচনার প্রয়োজন হবে না) বিবেচিত হবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে তা গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

❑ রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে যেসকল পদের প্রধান

১। প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান (সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর); ২। সকল পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য; ৩। বাংলাদেশ স্কাউটের প্রধান; ৪। রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনসমূহের প্রধান; ৫। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ৬। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি;

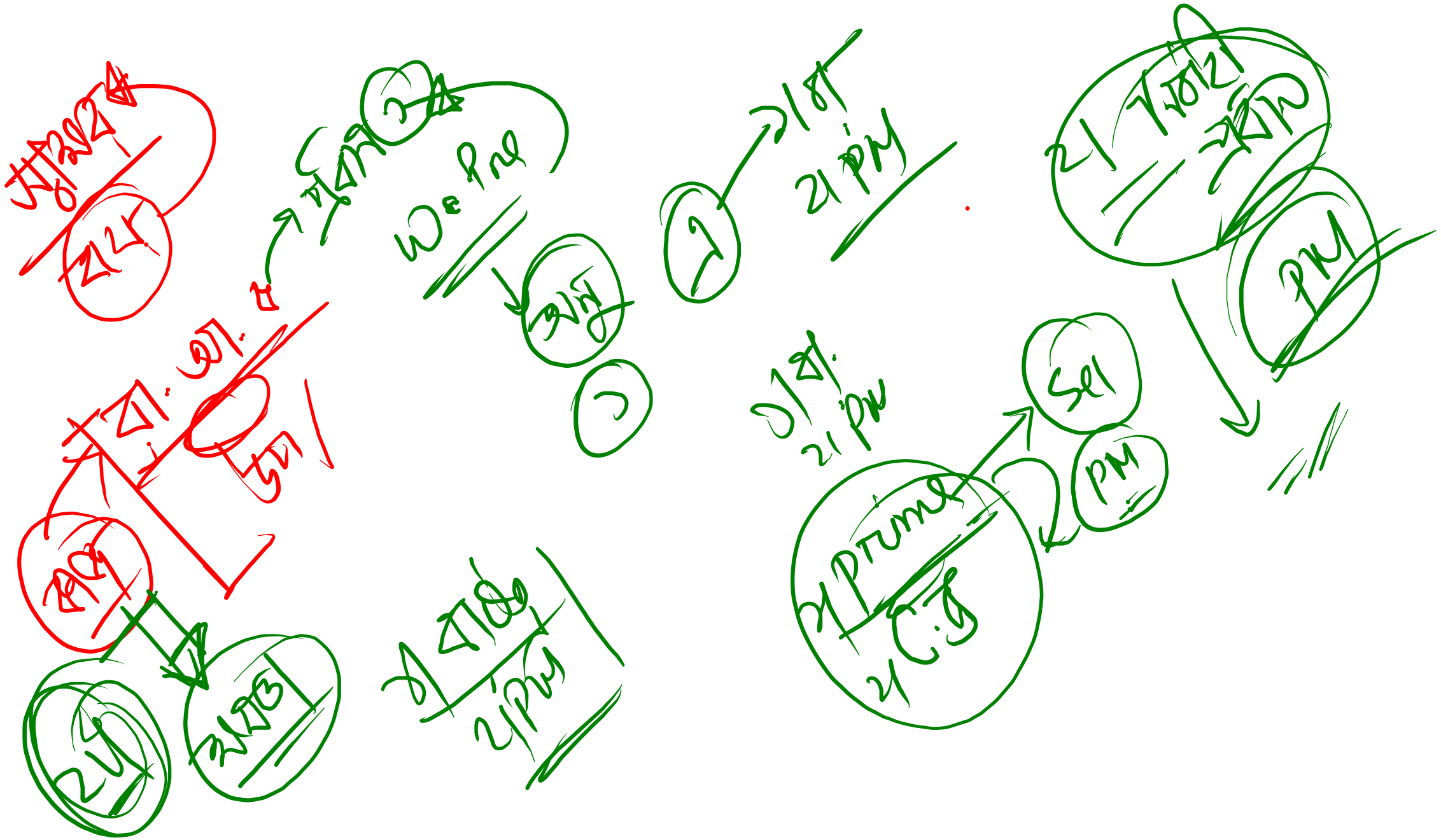

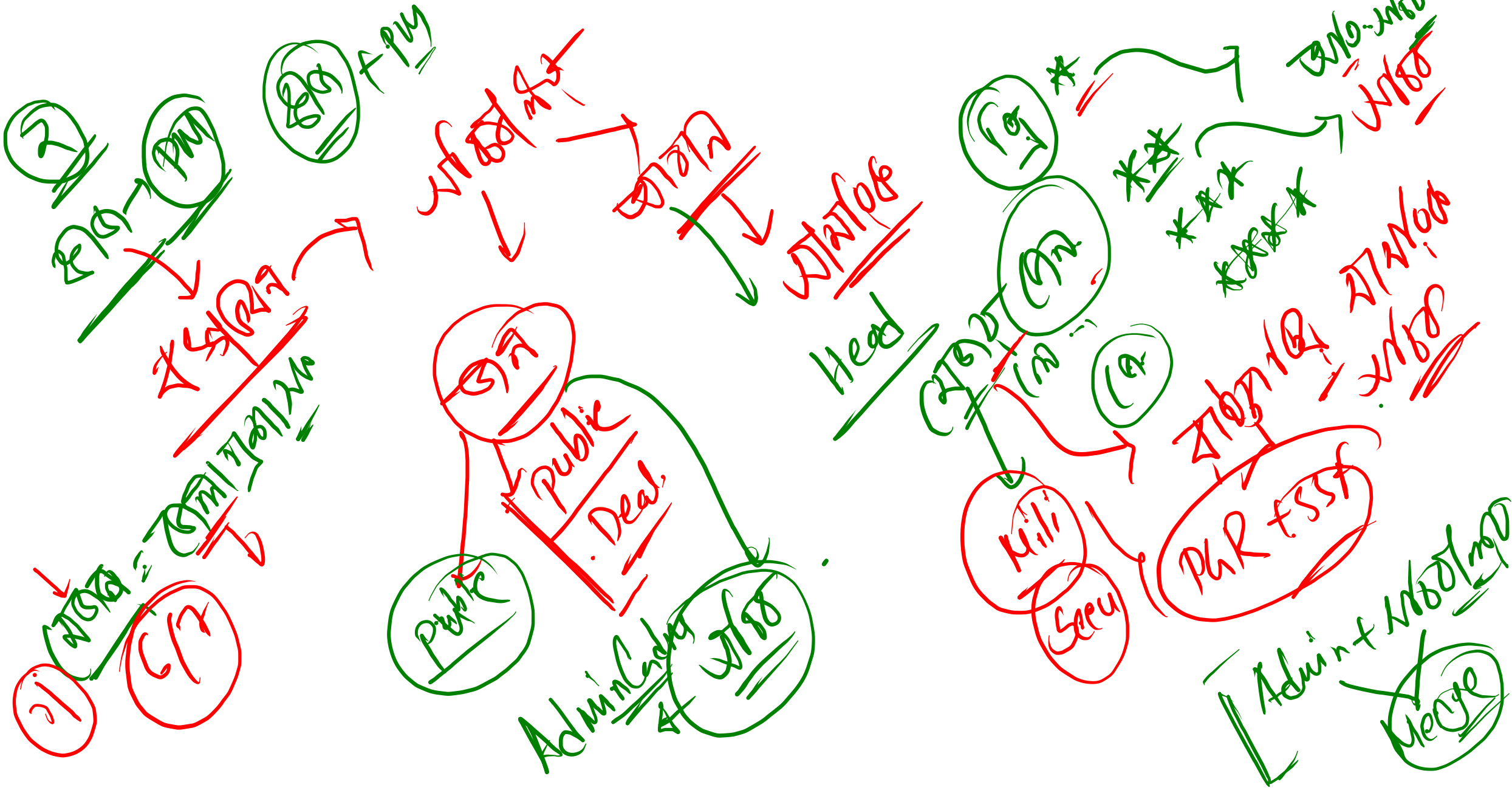

PM
public
Deal
Public
Head
Admin
Merge

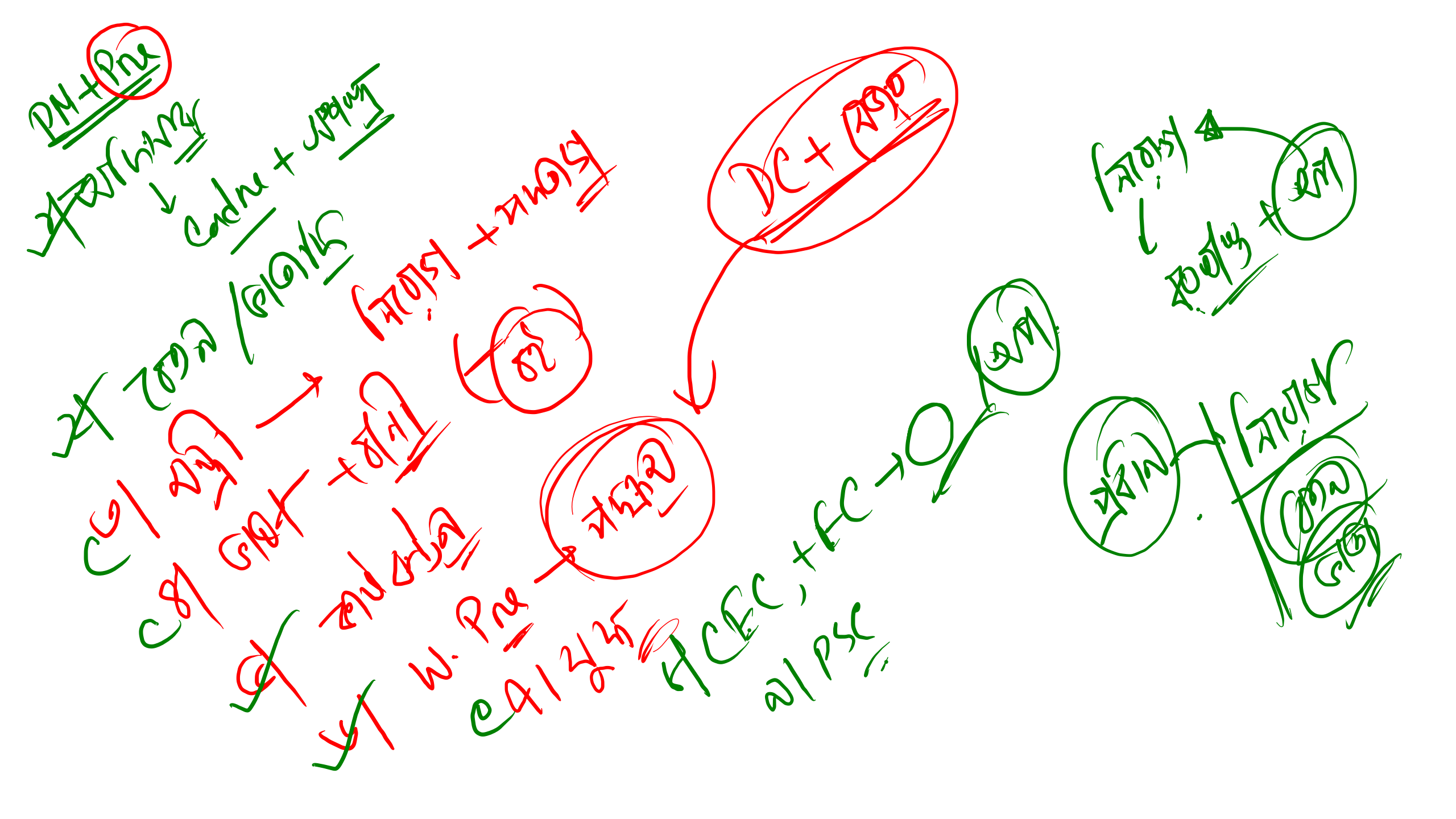

Cadre
Civil
Admin
Amb
Foreign
President
Govt
PWD
Dep

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ

❑ প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান। সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ অনুচ্ছেদ মতে, প্রধানমন্ত্রী পদায়িত হবেন মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভা তাঁদের কার্যাবলির জন্য যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকৃত নির্বাহী। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগকালীন সময়ে সংসদের যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থন রয়েছে মর্মে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হবে, উক্ত সদস্যকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ

❑ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- প্রধানমন্ত্রীর শাসন বিষয়ক ক্ষমতা
- নিয়োগ বিষয়ক ক্ষমতা
- আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা
- সংসদীয় কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা
- মন্ত্রিসভার কাজের সমন্বয় সাধনে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা
- বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা
- জাতির মুখপাত্র
- রাষ্ট্রপতির সাথে সম্পর্ক

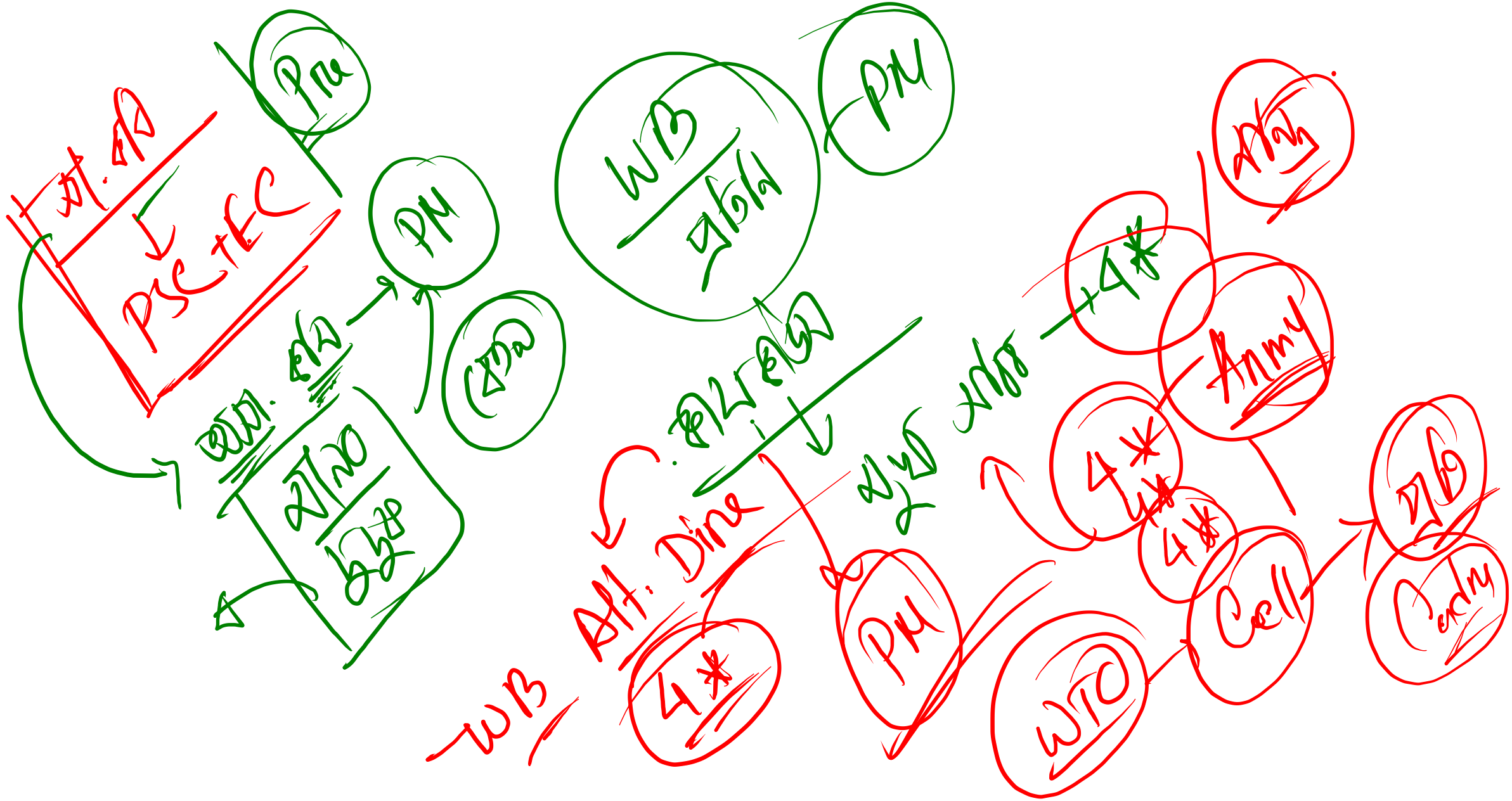

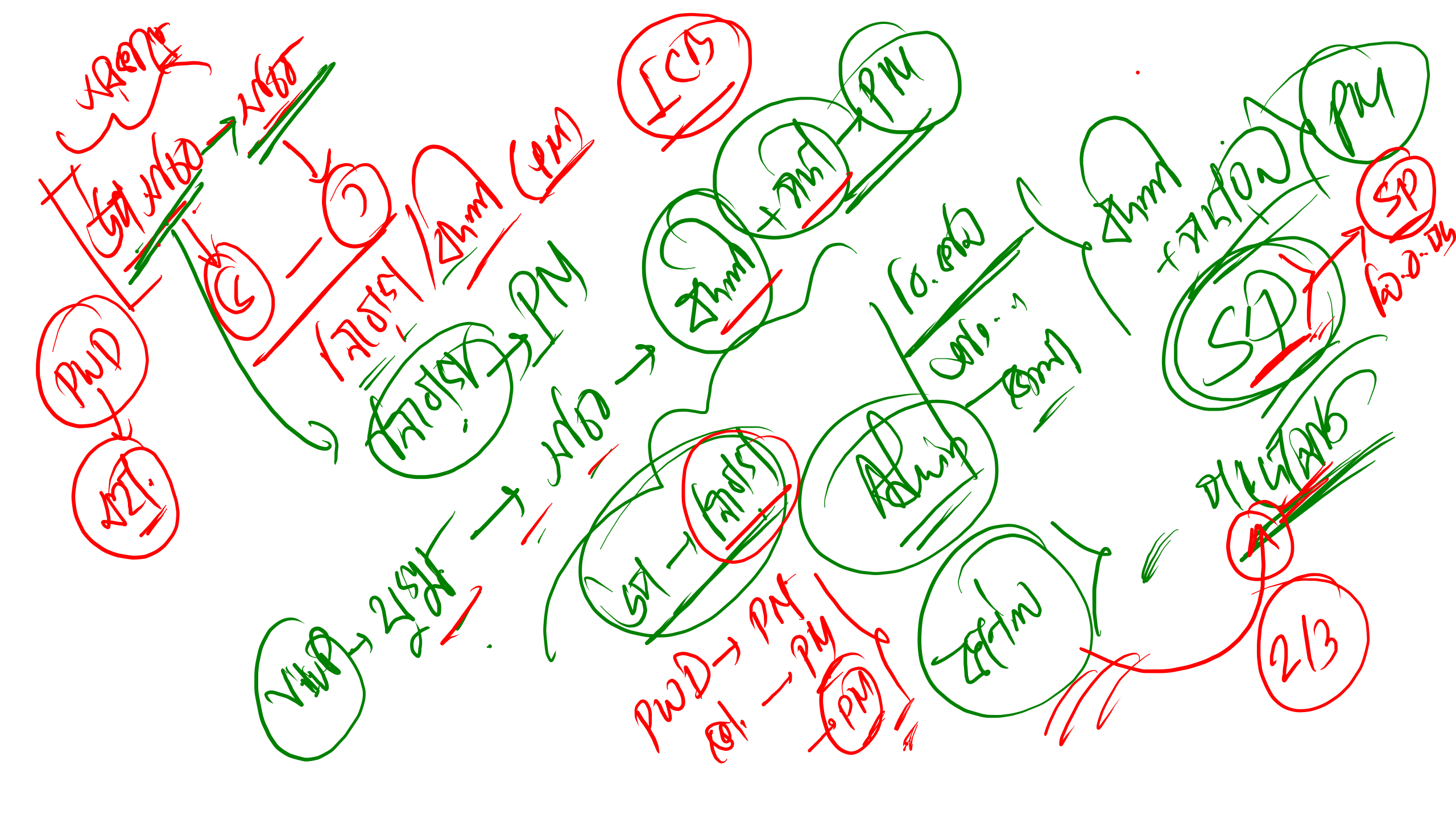

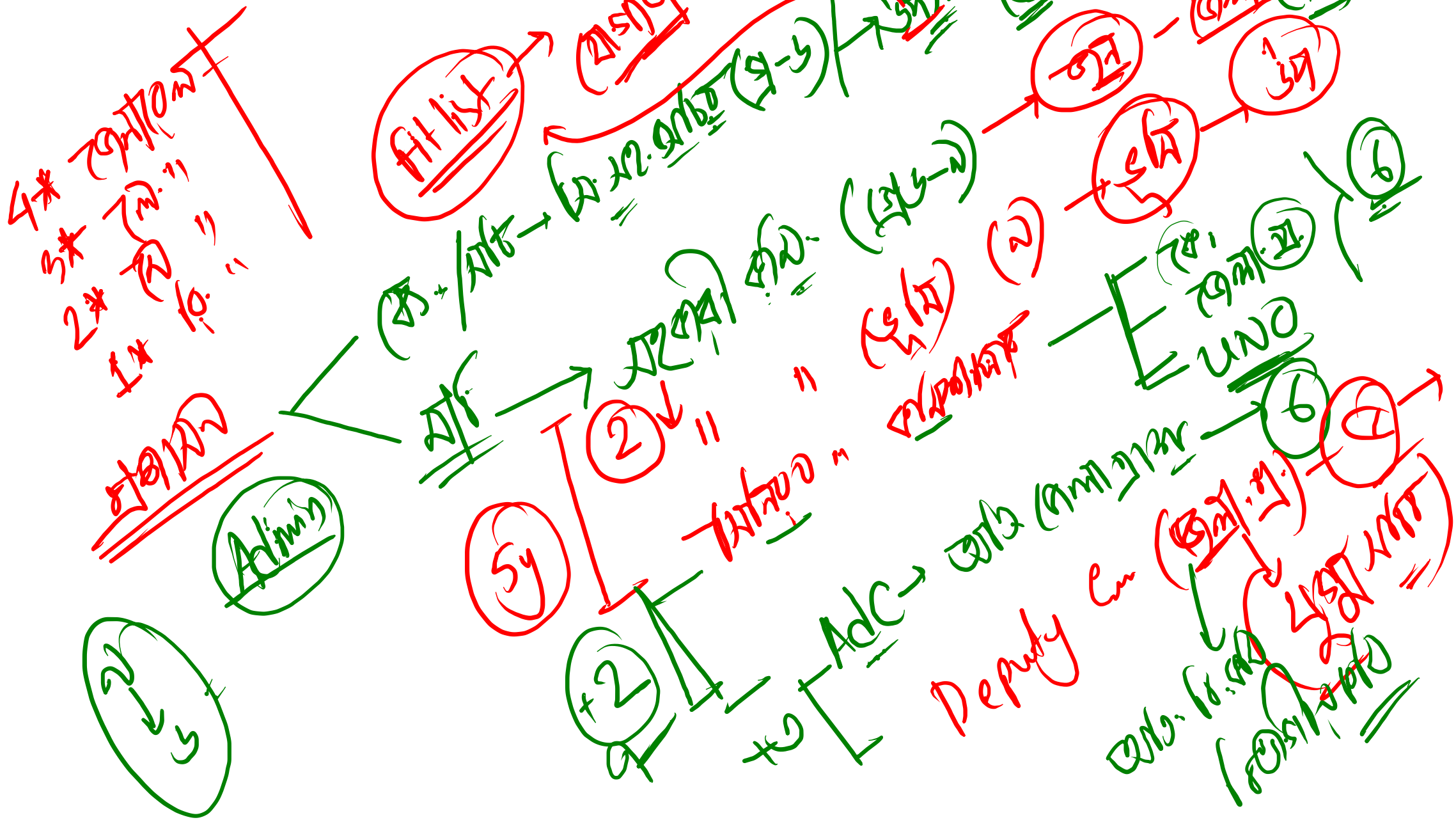

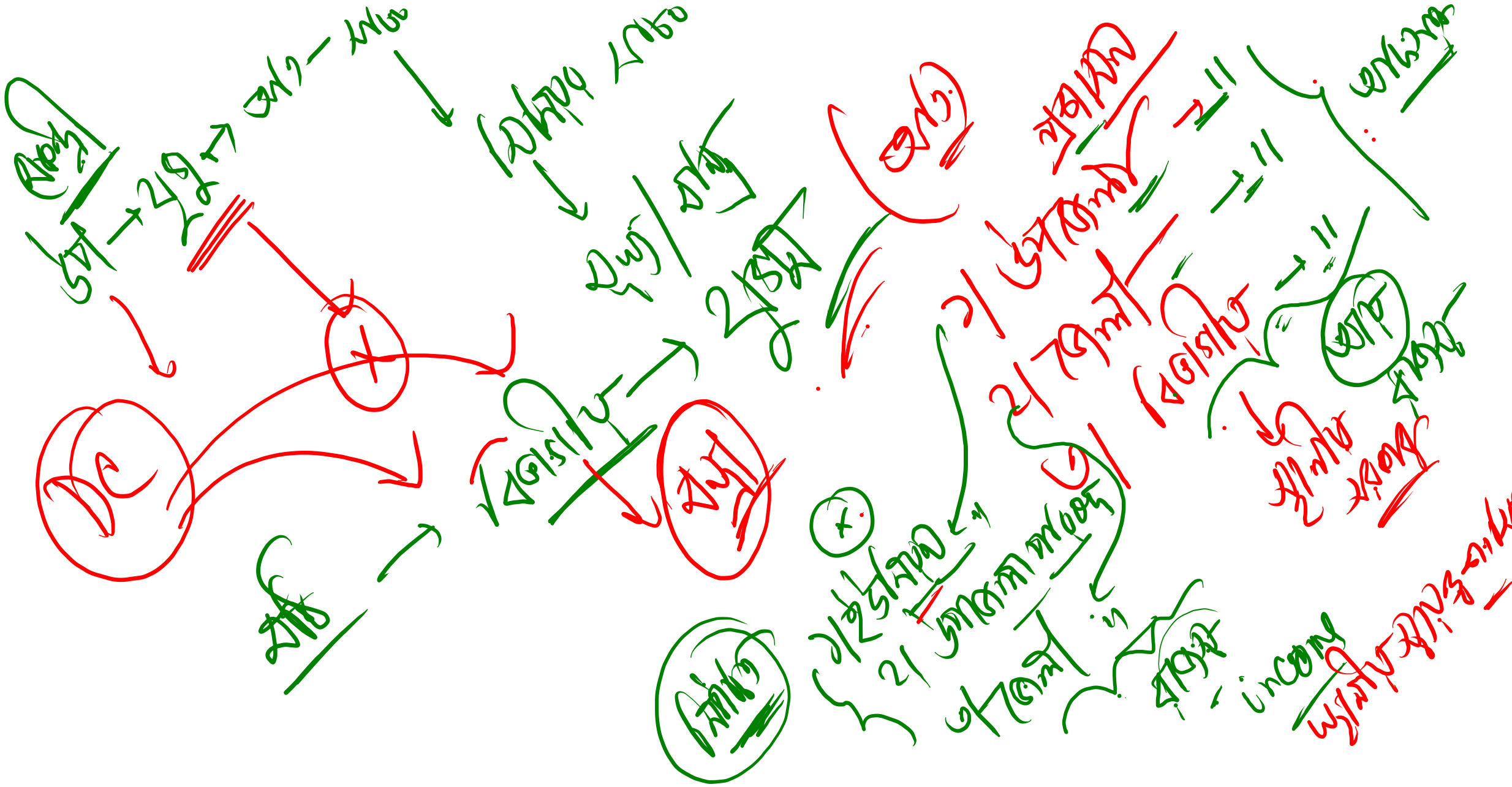

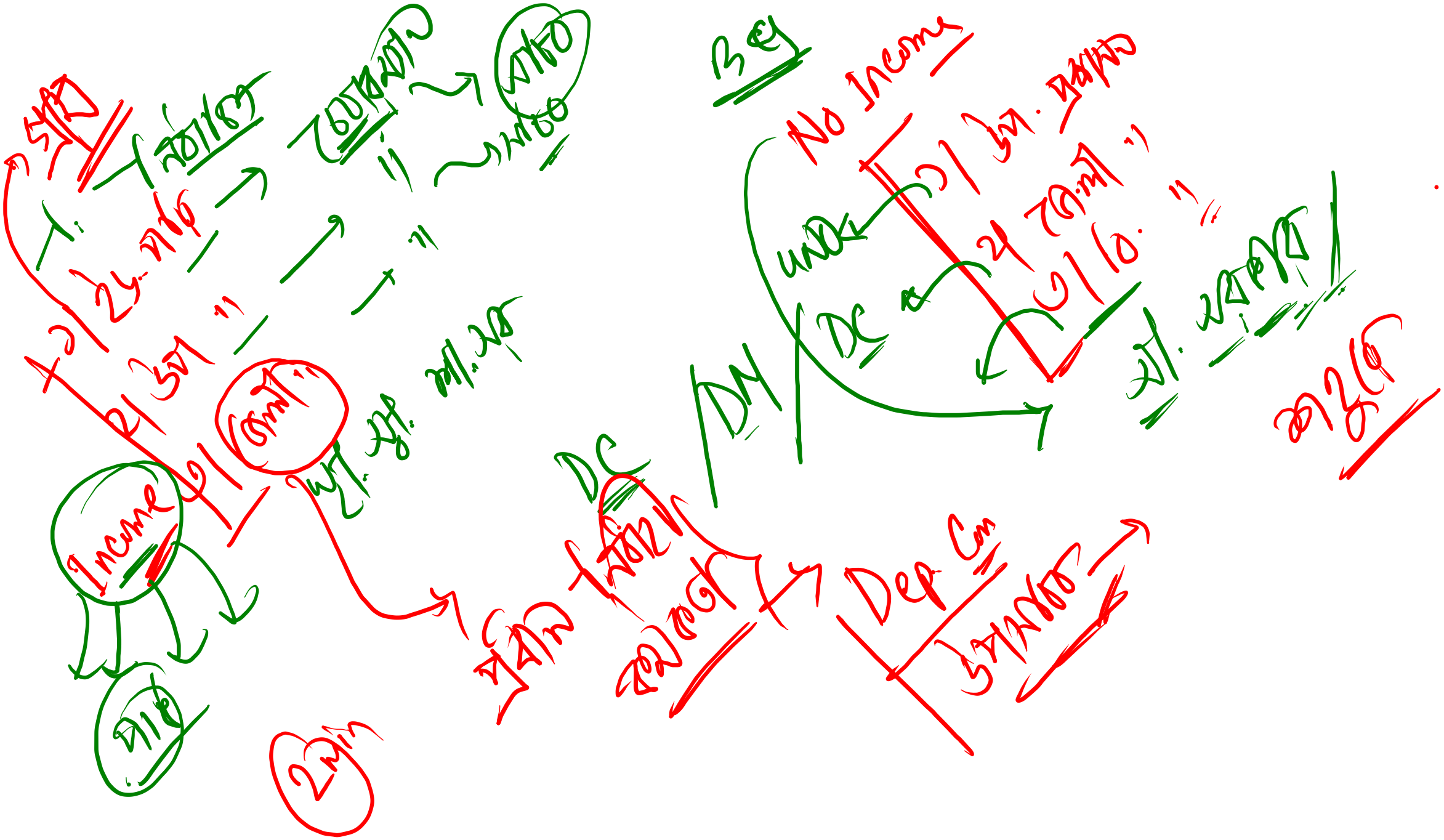

Income
No Income
Bey
DC
DN
UNDC
Dep Con
2min

বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ

❑ জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ৬৫নং অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,

(১) 'জাতীয় সংসদ' (House of the Nation) নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হবে।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে। সদস্যগণ 'সংসদ সদস্য' বলে অভিহিত হবেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের 'জাতীয় সংসদ' সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্য এবং সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত ৫০ নারী সদস্যসহ মোট ৩৫০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫টি হতে বৃদ্ধি করে ৫০টি করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন আরো ২৫ বছরের জন্য বহাল রাখা হয়েছে। মহিলা সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ

❑ আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা

সংবিধানের ৬৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে একটি আইনসভা থাকবে এবং এর উপর প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারে। সংসদ আইনের মাধ্যমে যেকোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপ-বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে পারে। সংসদ প্রণীত আইনে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করেন।

❑ সরকার গঠন বিষয়ক ক্ষমতা

সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন হয়।

❑ শাসন বিভাগের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৩) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ

❑ অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রের অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে তার উপর সংসদ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সংসদের অনুমোদন ও কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো প্রকার ব্যয় করা যায় না। আবার কোনো কর আরোপ বা কর সংগ্রহ করতেও সংসদের অনুমতি নিতে হয়।

❑ বিচার বিষয়ক ক্ষমতা

সংসদ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারে। সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণ করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

❑ নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, ন্যায়পাল ইত্যাদি পদের নির্বাচনী ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সংসদের বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ

❑ সংবিধান সংরক্ষণ ও সংশোধন

সংবিধানের আমানতদার হিসেবে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনীও সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

❑ অন্যান্য ক্ষমতা

সুপ্রিমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষমতাও সংসদের। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধান সংসদ প্রণয়ন করে।

❑ সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (অনুচ্ছেদ ৬৬)

যোগ্যতা	ক)বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে; খ) তার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে হবে।
অযোগ্যতা	ক) আদালত যদি তাকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করেন; খ) যদি তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন; গ) তিনি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন; ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়; ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন। যেমন: যুদ্ধাপরাধ। চ) তিনি যদি প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকেন।

বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ

❑ সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হওয়া (অনুচ্ছেদ ৬৭)

অনুচ্ছেদ ৬৭-তে একজন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলি আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষিত হবে–

ক) নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে যদি তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ না করেন।

খ) সংসদের অনুমতি ছাড়া যদি কোনো সংসদ সদস্য একাধারে নব্বইটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন;

গ) যদি সংসদ ভেঙে যায়;

ঘ) যদি তিনি ৬৬ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফায় উল্লিখিত যে কোনো একটি বা একাধিক অযোগ্যতাসমূহের মধ্যে পড়েন;

ঙ) যদি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ

❑ ফ্লোর ক্রসিং (অনুচ্ছেদ ৭০)

কোনো একটি দলের মনোনয়ন নিয়ে কোনো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর দল ত্যাগ করলে একে ফ্লোর ক্রসিং বা দলত্যাগ বলে।

সংবিধানের ৭০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, পরবর্তীতে দুটি কারণে তার আসন শূন্য হতে পারে। যথা–

(ক) তিনি যদি ঐ দল থেকে পদত্যাগ করেন;

(খ) তিনি যদি সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানেই ৭০ অনুচ্ছেদে **দলত্যাগ বিরোধী বিধান** সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দল ত্যাগ অথবা ফ্লোর ক্রসিং এর বিধানকে আরো কঠোরতর করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের মেয়াদ, কার্যপ্রণালি ও কমিটি ব্যবস্থা

❑ সংসদের মেয়াদ

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ৫ বছর পূর্তির পর স্বাভাবিকভাবেই সংসদ ভেঙ্গে যায়। তবে মেয়াদপূর্তির পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হলেও প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হলে সংসদ আইন দ্বারা এর কার্যকাল সর্বোচ্চ এক বছর বাড়াতে পারে। [অনু.৭২(৩)] সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিংবা অতীব জরুরি হওয়ায় রাষ্ট্রপতি পুনরায় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন [অনু.৭২(৪)]।

❑ সংসদের কোরাম

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী কোরাম হওয়ার জন্য ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। সংসদের কার্যক্রম চলাকালে যদি ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হন, এ বিষয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উপরিউক্ত সংখ্যক সদস্য অধিবেশনে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার বৈঠক মুলতুবি করেন [অনু.৭৫(২)]।

জাতীয় সংসদের মেয়াদ, কার্যপ্রণালি ও কমিটি ব্যবস্থা

❑ সংসদের অধিবেশন

সংবিধানের ৭২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংসদ আহ্বান করার সময় রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করেন। নিয়মানুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। বছরে কমপক্ষে দু'বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসা বাধ্যতামূলক। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকতে পারবে না।

❑ সংসদের কার্যপ্রণালি বা রুলস অব প্রসিডিউর

জাতীয় সংসদ তার কার্যাবলি পরিচালনার জন্য সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যপ্রণালি বিধি প্রণয়নের অধিকার লাভ করেছে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালি বিধি' অনুযায়ী সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্পিকার সংসদে সভাপতিত্ব করেন। সংসদ পরিচালনার জন্য স্পিকার প্রয়োজনে রুলিং প্রদান করেন। স্পিকারের রুলিং মেনে চলা প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য। স্পিকার সাধারণত সংসদে ভোট দেন না। তবে সংসদে কোনো বিষয়ে ভোট অনুষ্ঠানকালে উভয় পক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়লে স্পিকার নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন।

জাতীয় সংসদের মেয়াদ, কার্যপ্রণালি ও কমিটি ব্যবস্থা

❑ সংসদের কমিটি ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে স্থায়ী কমিটি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ (ক) সরকারি হিসাব কমিটি, (খ) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং (গ) কার্যপ্রণালি বিধি মোতাবেক অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠন করে থাকে।

জাতীয় সংসদের মেয়াদ, কার্যপ্রণালি ও কমিটি ব্যবস্থা

❑ সংসদ সচিবালয়

জাতীয় সংসদ ও সংসদের কমিটি সমূহের কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য আইনানুযায়ী সংসদের একটি নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে, যার নাম হলো 'বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়'। সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সচিবালয় গঠিত। সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও কাজের শর্তসমূহ আইন দ্বারা নির্ধারিত। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী হলেন স্পিকার আর প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। এখন পর্যন্ত সরকারের সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে সংসদ সচিবালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংসদের অধিবেশন পরিচালনার জন্য যাবতীয় দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান যেমন: কার্যপ্রণালি নির্ধারণ ও সংসদের আলোচ্যসূচি চূড়ান্ত করে সদস্যদের জানিয়ে দেয়া, সংসদ অধিবেশন চলাকালে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা, কমিটি সমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা ইত্যাদি জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কাজ। সংসদের অভ্যন্তরে যে লাইব্রেরি রয়েছে তার পরিচালনা ও সংসদ সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা, গবেষণা পরিচালনা করাও সংসদ সচিবালয়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

একটি দেশের আইনসভার প্রধান কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা। বাংলাদেশের সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা আছে। আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভাকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধাপ বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আইন প্রণয়নের জন্য যে ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয় সংসদীয় পরিভাষায় তাকে 'Reading' বা পাঠ বলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানে ৮০ থেকে ৯২ অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতার বিধান রাখা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

❑ সরকারি ও বেসরকারি বিলের মাঝে পার্থক্য

সরকারি বিল	বেসরকারি বিল
যে সকল বিল মন্ত্রীগণ কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত হয় তাদেরকে সরকারি বিল বলা হয়।	যেসব বিল সংসদের যেকোনো সাধারণ সদস্য (মন্ত্রী ব্যতীত) কর্তৃক উত্থাপিত হয় তাদেরকে বেসরকারি বিল বলে।
সরকারি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদেরকে ৭ দিনের নোটিশ দিতে হয়। অবশ্য স্পিকার ইচ্ছা করলে নোটিশ প্রদানের সময় (৭ দিন) আরো কমিয়ে দিতে পারেন। [সংসদ কার্য প্রণালি বিধি-বিধি নং- ৭২ ও ৭৫]	কোনো সাধারণ সদস্য বেসরকারি বিল উত্থাপন করতে চাইলে তাকে সংসদ সচিবের নিকট ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হবে এবং উক্ত নোটিশের সাথে বিলের প্রতিলিপি দিতে হবে।
বৃহস্পতিবার ছাড়া বাকি সব কয়দিনই সরকারি কাজের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং সরকারি বিল বৃহস্পতিবার ছাড়া যেকোনো দিন সংসদে উত্থাপন করা যায়। [সংসদ কার্যপ্রণালি বিধি-বিধি নং- ৭৪(১), ৭৫(৩) ও ২৫]	শুধুমাত্র বেসরকারি সদস্যদের কাজের জন্য নির্ধারিত দিনেই বেসরকারি বিল সংসদে উত্থাপন করা যায়। সপ্তাহে মাত্র একদিন (বৃহস্পতিবার) বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি প্রাধান্য পায়।

জাতীয় সংসদের আর্থিক কর্মকান্ড

❑ অর্থবিল (অনুচ্ছেদ ৮১)

'অর্থবিল' বলতে শুধু নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বা এদের যেকোনো একটি সম্পর্কিত বিধানাবলি সংবলিত বিল বুঝাবে:

(ক) কোনো ধরনের কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোনো গ্যারান্টি প্রদান, বা সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো আইনের সংশোধন;

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, ওই তহবিলে অর্থ প্রদান বা ওই তহবিল থেকে অর্থদান বা নির্দিষ্টকরণ;

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোনো দায় রদবদল বা বিলোপ;

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

জাতীয় সংসদের আর্থিক কর্মকান্ড

❑ সংযুক্ত তহবিল (অনুচ্ছেদ ৮৪)

সরকারের প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার সংগৃহীত সকল ঋণ এবং সরকারের ঋণ পরিশোধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ যে তহবিলের অংশে পরিণত হয় সেটিকে সংযুক্ত তহবিল (Consolidated Fund) বলে। সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, দায় বদল ও বিলোপ এবং এই ধরনের তহবিল নিরীক্ষার কাজ জাতীয় সংসদের। সংযুক্ত তহবিল সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি সংসদে বিল উত্থাপনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হয়।

❑ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (অনুচ্ছেদ ৮৭)

(১) প্রতি অর্থবছর সম্পর্কে ওই বছরের জন্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয় সংবলিত একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, যা বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি নামে অভিহিত। একে সাধারণ অর্থে বাজেট বলা হয়।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রদর্শন করা হবে-

(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীনে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় হিসেবে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং

(খ) সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে এমন প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

উল্লেখ থাকে যে, অন্যান্য ব্যয় থেকে রাজস্ব খাতের ব্যয় পৃথক করে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে প্রদর্শন করতে হবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীতে এমন খুব কম দেশই রয়েছে যেখানে গণতন্ত্র সুসংহত অথচ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নেই। বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে এই ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই ইউনিটের আলোচনায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও এর কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ স্থানীয় শাসন

স্থানীয় বা Local শব্দটির উদ্ভব হয়েছে Locus শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ হলো অঞ্চল। সুতরাং স্থানীয় সরকারের অর্থ হলো অঞ্চলভিত্তিক সরকার। স্থানীয় সরকার মূলত কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কোনো একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমাণে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

(ক) আইনগত ভিত্তি,

(খ) স্থানীয় এলাকার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,

(গ) স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিরসনের জন্য বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ,

(ঘ) জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা,

(ঙ) নিজস্ব তহবিল গঠনের জন্য করারোপের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ,

(চ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ।

স্থানীয় সরকার স্বশাসিত হলেও এটি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভেতরে সরকার।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ ইউনিয়ন পরিষদ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে এর গুরুত্ব অনেক। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে এডভোকেট রহমত আলীর নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ সংশোধন করে এ ক্ষেত্রে কতিপয় নতুন বিধান সংযোজন করা হয়।

❑ গঠন

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। নতুন ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদকে পূর্বের ৩টি ওয়ার্ডের পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। বর্তমানে ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১জন করে ৯ জন সাধারণ সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে নারী সদস্য সরাসরি পুরুষ ও নারী সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪,৫৭১টি।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ কার্যাবলি

স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এই বিষয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা, গ্রামীণ অবকাঠামো, রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামত, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুস্থদের সাহায্য, কৃষি, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য ও পশুপালন, কুটির শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র নারী ও পুরুষদের সহায়তা ও উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত ভিজিডি, শিক্ষার বিস্তার, পরিবেশের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে গ্রামীণ জনগণকে উৎসাহিত করাও ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব। স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিরসনে ইউনিয়ন পরিষদ ছোটখাট বিচারমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ উপজেলা পরিষদ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমোচ্চ কাঠামোয় ইউনিয়ন পরিষদের উপরের স্তরটিই হলো উপজেলা পরিষদ। ১৯৮২ সালে জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ সামরিক শাসন জারির পরপরই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশের আলোকে তিনি প্রাথমিকভাবে থানাসমূহের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি থানায় থানা পরিষদ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি থানাসমূহকে উপজেলায় উন্নীত করেন এবং সেই সাথে থানা ও জেলার মধ্যবর্তী স্তর মহকুমা বিলুপ্ত করেন। উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্গঠন (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর আওতায় সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উপজেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর গঠিত বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার উপজেলা ব্যবস্থা বাতিল করে তদস্থলে থানা প্রশাসন ব্যবস্থা পুনঃবহাল করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণে যে নির্বাচনি ওয়াদা করেছিল তারই অংশ হিসেবে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃবহাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ গঠন

একজন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলার অধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) চেয়ারম্যান এবং তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। চেয়ারম্যান, ১ জন মহিলা ও ১ জন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর।

❑ কার্যাবলি

উপজেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা ইত্যাদি পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

❑ তহবিল গঠন

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত হাট-বাজার ও জলমহাল সমূহের ইজারা থেকে প্রাপ্ত অর্থ, পেশা বা ব্যবসার উপর ধার্যকৃত কর, পরিষদ কর্তৃক দেয়া লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য কর এবং সরকারি অনুদান নিয়ে পরিষদের তহবিল গঠিত হয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ পৌরসভা

ঔপনিবেশিক সময়েই শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভা গঠন করা হয়েছিল। ১৮৪২ সালে প্রণীত মিউনিসিপ্যাল আইনে পৌরসভা গঠন করার বিধান থাকলেও তা নানা কারণে কার্যকর না হওয়ায় ১৮৬৪ সালে পুনরায় আইন পাশ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ বড় বড় শহরে পৌরসভা গঠন করা হয়। ১৮৬৮ সালে পুনরায় একটি আইন পাশ করে ছোট ছোট শহরে পৌরসভা গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (আদেশ নং-৭) পূর্বের পৌরকমিটি বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে পৌরসভা গঠন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে তিন শ্রেণির (A, B, C) ৩৩০টি পৌরসভা রয়েছে। সর্বশেষ ২১ অক্টোবর, ২০১৯ সালে সিলেট জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ পৌরসভা হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

❑ গঠন

১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত 'পৌরসভা (সংশোধন) বিল-১৯৯৮' এর বিধান অনুযায়ী পৌরসভাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। একজন নির্বাচিত মেয়র, প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে ৯ জন নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৩ জন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার কার্যকাল ৫ বছর।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ কার্যাবলি

পৌরসভা শহর এলাকায় নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– শহরে পানি সরবরাহ, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা, পার্ক ও উদ্যান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জননিরাপত্তা বিধান, গৃহ নির্মাণের জন্য প্ল্যান অনুমোদন, শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, রাস্তা-ঘাট ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ। পৌর এলাকায় চলাচলের জন্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান এবং ছোট ছোট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করাও পৌরসভার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

❑ আর্থিক তহবিল

বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক তহবিল গঠন করা হয়। পৌরসভা কর্তৃক প্রদানকৃত যানবাহনের লাইসেন্স ফি, হাট-বাজার ও জলমহাল সমূহের ইজারা থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং সরকারি অনুদান পৌরসভার আয়ের অন্যতম উৎস।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

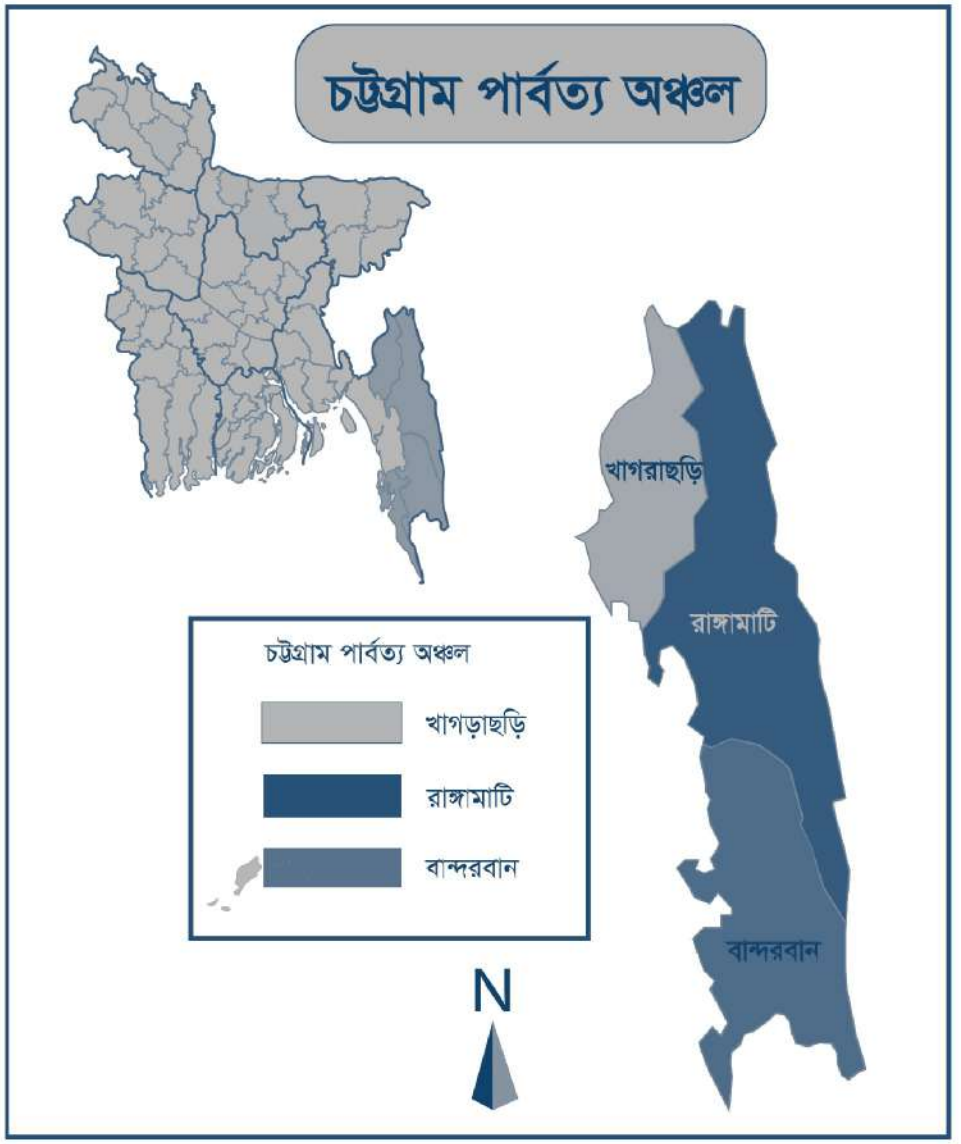

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন-১৯৮৯ পাশ হবার পর এই আইনের আওতায় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি বিশেষ ধরনের জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তন করা হয়। শান্তি চুক্তি এবং পরবর্তীতে প্রণীত আইনে জেলা পরিষদের গঠন-কাঠামোয় কোথাও কোথাও কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন- পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম সংশোধন করে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ এ নামকরণ করা হয়েছে। পূর্বে মহিলাদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত না থাকলেও সংশোধিত আইনে ৩টি আসন তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি পৃথক আইন পাশ হলেও এদের গঠন প্রকৃতি একই।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

❑ গঠন কাঠামো ও প্রকৃতি

আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি জেলা পরিষদ সর্বমোট ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এর মধ্যে ১ জন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। পরিষদের সকল প্রতিনিধি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ৩ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে ২ জন হবেন উপজাতীয় এবং ১ জন হবেন বাঙালি। তবে, মহিলারা সংরক্ষিত আসন ছাড়া সাধারণ আসনেও প্রার্থী হতে পারবেন। আইন অনুযায়ী, চেয়ারম্যান হবেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর।

বাংলাদেশের প্রশাসন

❑ বাংলাদেশের প্রশাসন কাঠামো

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের শাসনাধীন একটি প্রদেশ। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ছিল প্রাদেশিক। পাকিস্তান সরকারের দীর্ঘ শাসন ও শোষণের ফলে এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপক উন্নতিমূলক কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি আমলের পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটা অনুপযোগী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার স্তরগুলো হলো-

বাংলাদেশের প্রশাসন

❑ কেন্দ্রীয় প্রশাসন

রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাজধানী ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সচিবালয়ের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখাসমূহে বিস্তৃত।

❑ সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়

১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকারের অধীনে ১২টি মন্ত্রণালয় ছিল। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের অধীনে ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল। এরশাদ সরকারের আমলে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ছিল ২৬টি। বর্তমানে দেশে ৪৩ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ রয়েছে।

❑ স্থানীয়/ মাঠ প্রশাসন

সরকারের প্রবর্তিত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রশাসন বলে। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা, তারা সকলেই সরকারি কর্মচারী। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। মূলত নাগরিকের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কাজ যুগোপযোগী করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা।

❑ বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার

প্রত্যেক বিভাগের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করছেন বিভাগীয় কমিশনার। তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একজন এজেন্ট হিসেবে কর্মরত। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে ৮টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো: (১) ঢাকা বিভাগ (২) চট্টগ্রাম বিভাগ (৩) রাজশাহী বিভাগ (৪) খুলনা বিভাগ (৫) বরিশাল বিভাগ (৬) সিলেট বিভাগ (৭) রংপুর বিভাগ ও (৮) ময়মনসিংহ বিভাগ।

❑ বিভাগীয় প্রশাসনের অবস্থান

বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য ও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন। বিভাগীয় কমিশনার প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বিষয়ক কর্মচারী। তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি তদারকি করার পাশাপাশি বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

❑ কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরে বিভাগীয় প্রশাসন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরই বিভাগীয় প্রশাসনের অবস্থান। এজন্য কেন্দ্রের সাথে বিভাগের একটি যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সচিবালয় তথা কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলির আলোকে বিভাগীয় প্রশাসন নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

❑ বিভাগীয় কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বিভাগীয় কমিশনার প্রত্যেক বিভাগের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। বিভাগের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে সম্পাদিত হয়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থায় একজন অতিরিক্ত কমিশনার ও ব্যক্তিগত সহকারীসহ বহুসংখ্যক কর্মচারী নিয়োজিত। বিভাগীয় কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- ✓ প্রশাসন সংক্রান্ত
- ✓ রাজস্ব সংক্রান্ত
- ✓ উন্নয়নমূলক
- ✓ সেবামূলক সংক্রান্ত
- ✓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত
- ✓ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত
- ✓ রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার

❑ জেলা প্রশাসনের অবস্থান

জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা হলো স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ডেপুটি কমিশনার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য ও জেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনারের পরই ডেপুটি কমিশনারের স্থান। তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে জনগণের যোগসূত্র স্থাপনের মিলন সেতু। ডেপুটি কমিশনার এর মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতি ও কার্যাবলি বাস্তবায়িত হয়।

❑ কেন্দ্রের সঙ্গে প্রশাসনের সম্পর্ক

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের এক ও অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে। বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় থেকে জেলা সংক্রান্ত ব্যাপারে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরিত হয়। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ডেপুটি কমিশনার জেলা প্রশাসন পরিচালনা করেন। ডেপুটি কমিশনার তাঁর কাজের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দায়ী। বিভাগীয় কমিশনার আবার সকল কার্যাবলির জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী। বিভাগীয় কমিশনার কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেন।

প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ অবস্থা বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

❑ কেন্দ্রীভূত প্রশাসন

প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রশাসনের শীর্ষতম কর্মকর্তার কাছে কেন্দ্রীকরণের নামই কেন্দ্রীভূতকরণ। অর্থাৎ যেখানে প্রশাসনিক সংগঠনের সকল কার্য এবং দায়িত্ব কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় অফিসে বিদ্যমান থাকে তাকে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন বলা হয়। কেন্দ্রীভূতকরণ নীতির মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্থার নিম্নতম পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বকে ও ক্ষমতাকে সংকুচিত করা হয়। অন্য কথায় প্রশাসনিক সকল কর্তৃত্ব নিম্নস্তর থেকে ঊর্ধ্বতন স্তরে হস্তান্তর করার পদ্ধতিই হলো কেন্দ্রীভূতকরণ। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনে প্রশাসনিক স্তরের বিভিন্ন পর্যায়কে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

❑ কেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা

কেন্দ্রীকরণের সুবিধাসমূহ

- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- গোপনীয়তা রক্ষা
- শৃঙ্খলা রক্ষা
- নির্বাহীর অধিক ক্ষমতা ভোগ
- জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা

কেন্দ্রীকরণের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা

- স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি
- সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে না জানা
- অধস্তনদের নেতিবাচক মনোভাব
- নির্বাহীদের কর্মভার বৃদ্ধি
- ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

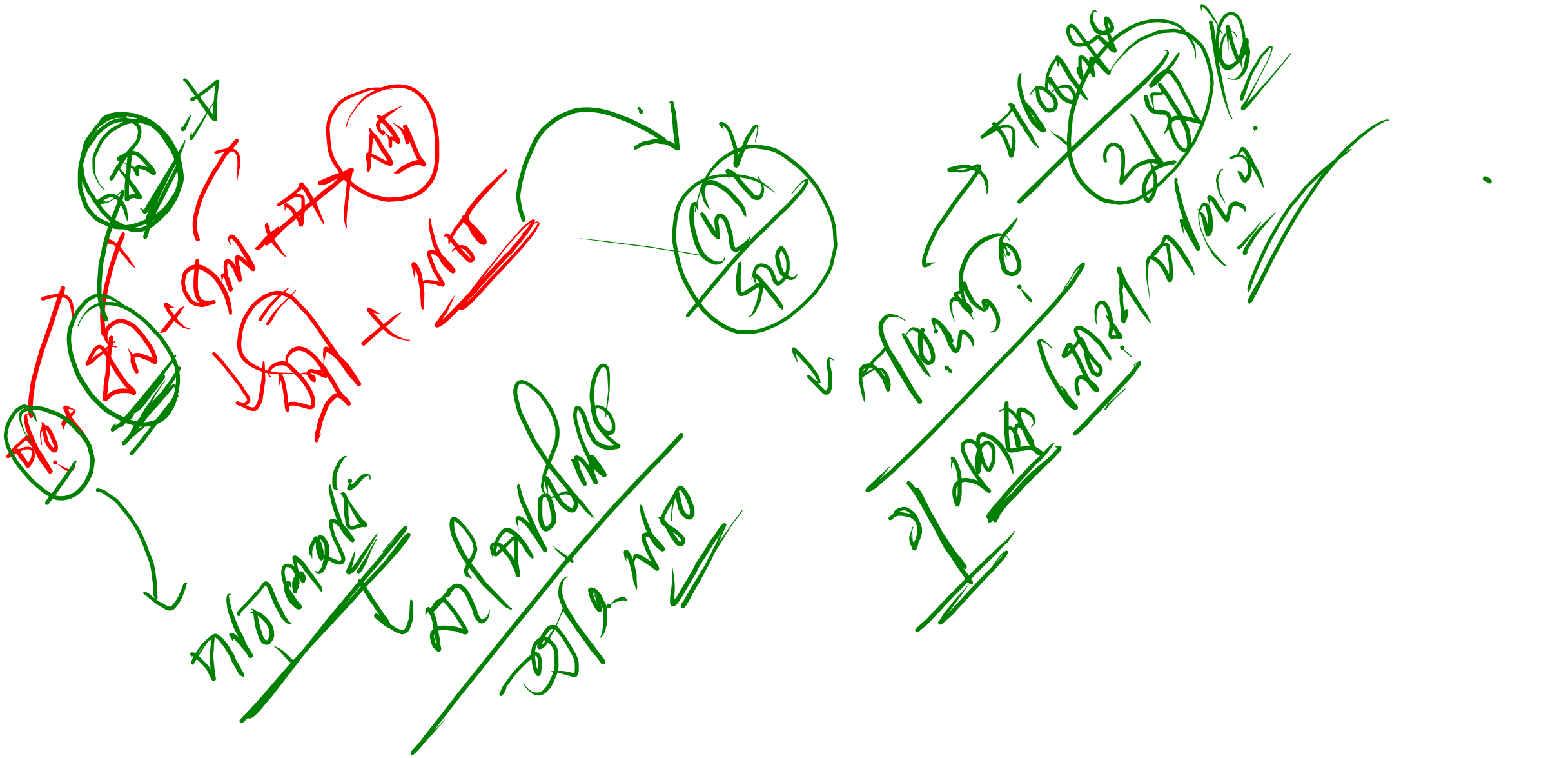

Rules Pn. pn
Remove
press
ten
10%
Present

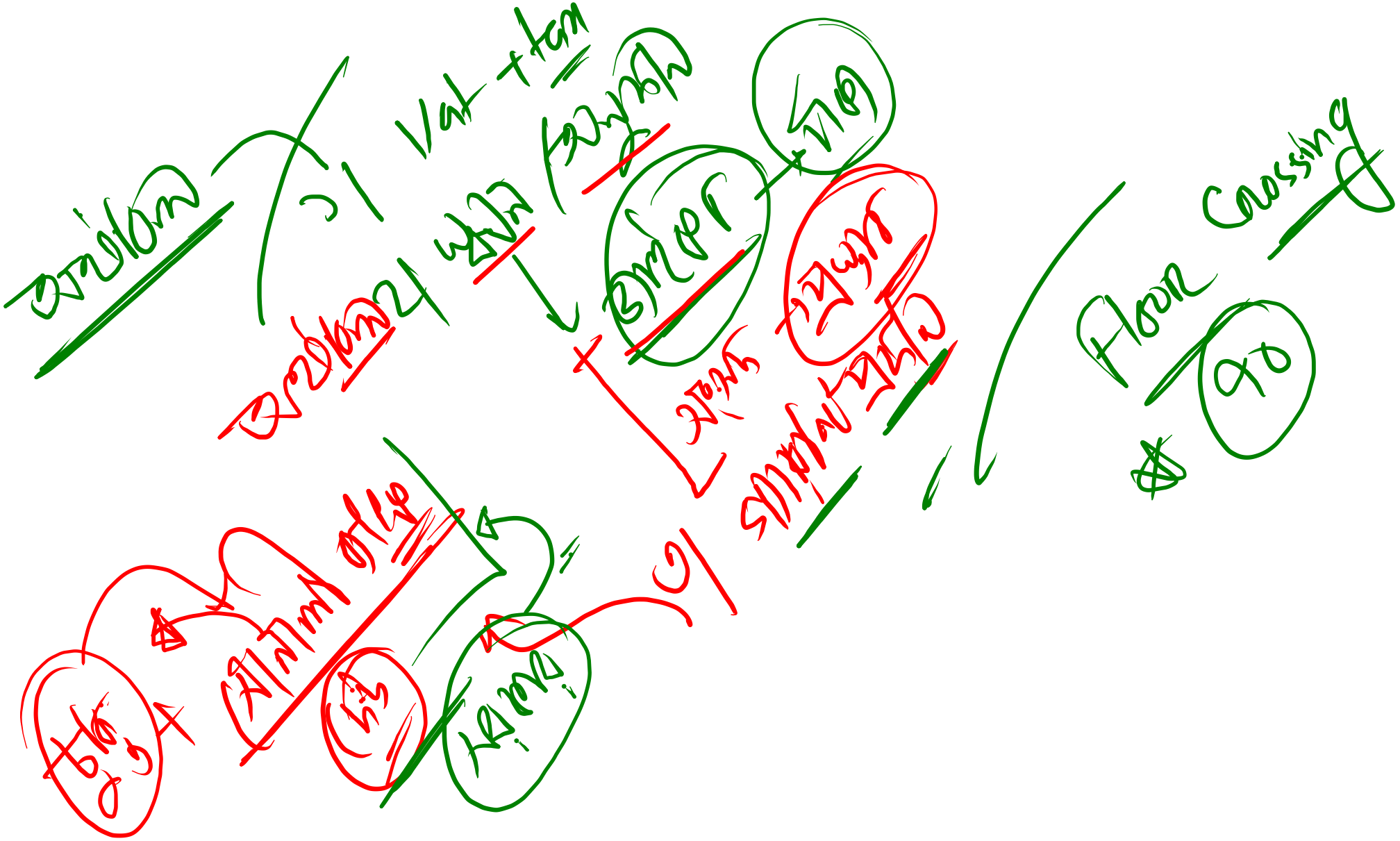

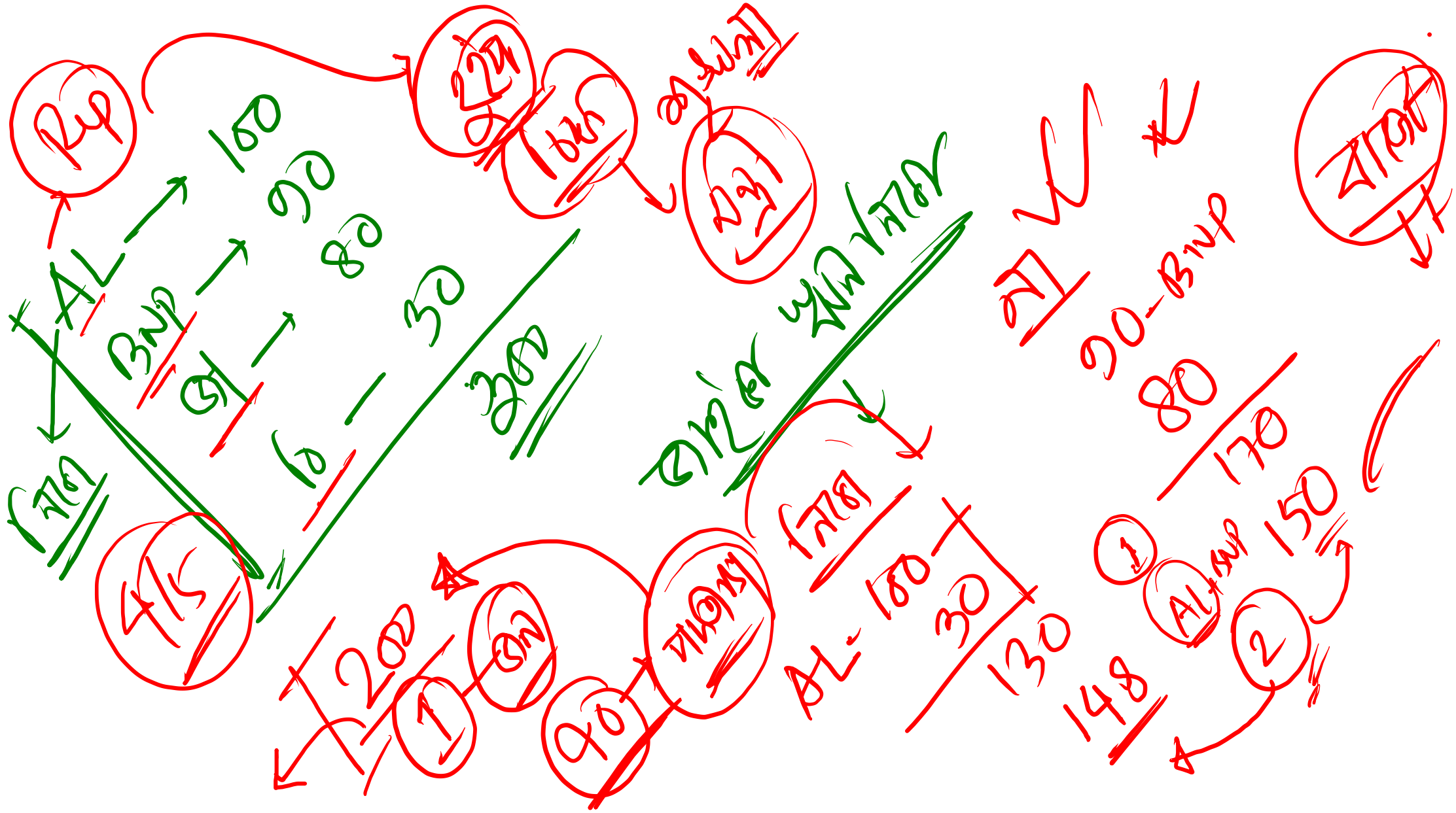

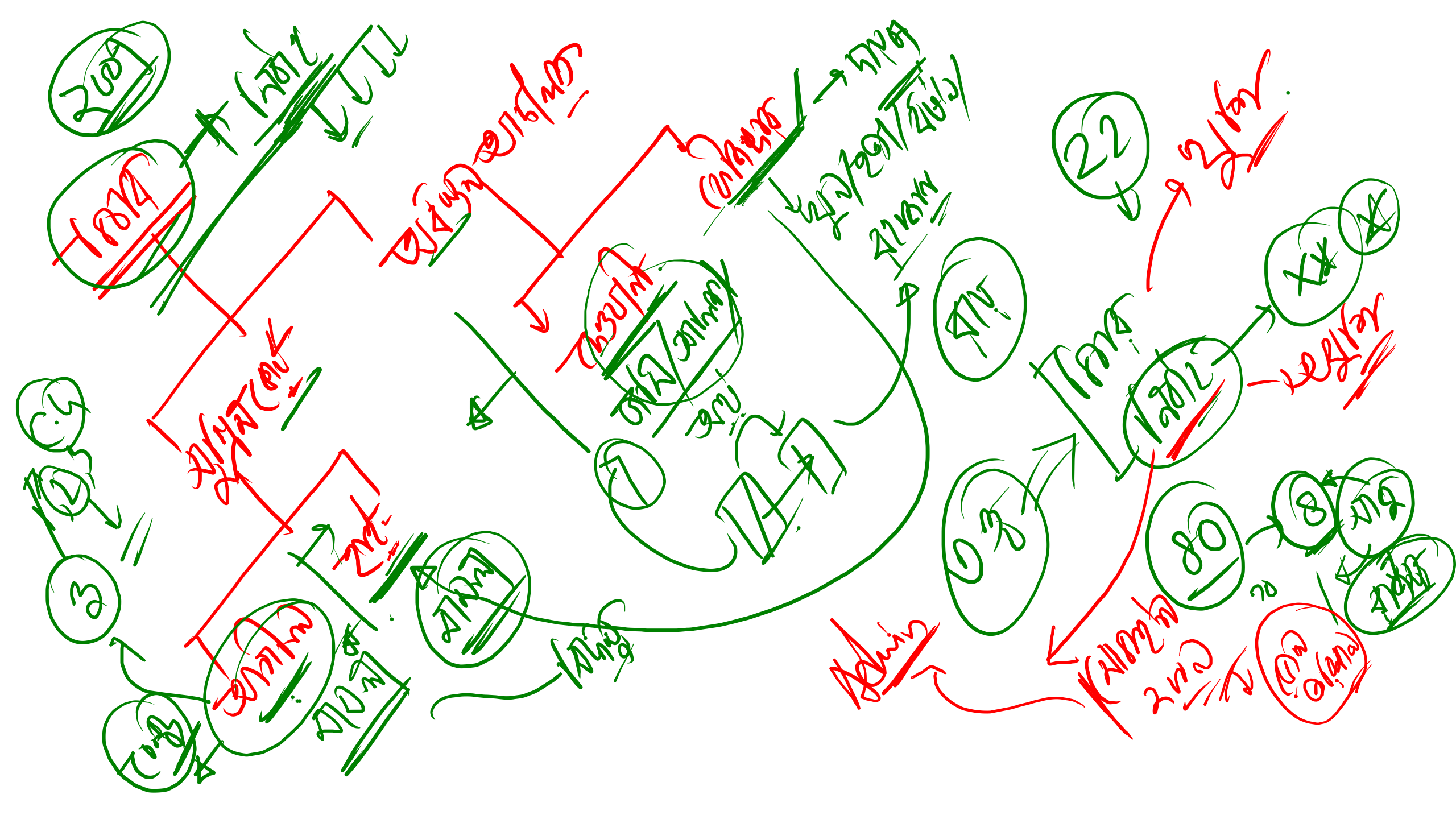

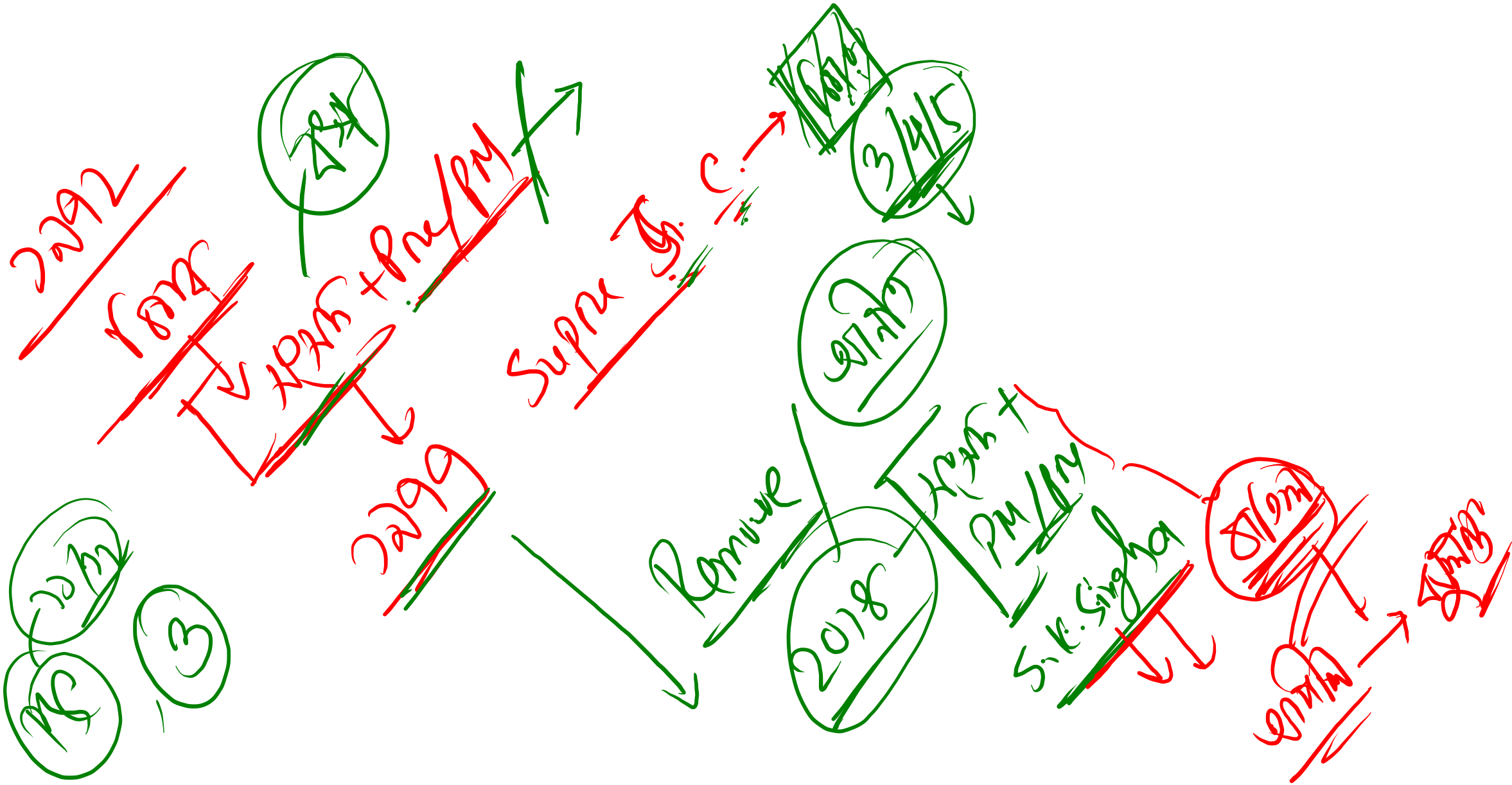

প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ অবস্থা বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

❑ বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন

প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে নিম্নতম পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়ে থাকে। অন্যকথায় প্রশাসনিক সংগঠনের সকল কার্য এবং দায়িত্ব কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না থেকে অধস্তন সংস্থাসমূহে বা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ❖ সংগঠনের সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা অর্পণ
- ❖ অধস্তন কর্মীদের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি
- ❖ এটি ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের সমন্বিত করার একটি প্রক্রিয়া
- ❖ এ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়
- ❖ বিকেন্দ্রীকরণে কর্মকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ অবস্থা বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

❑ বিকেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ

বিকেন্দ্রীকরণ প্রধানত দুই প্রকার যেমন: (ক) রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং (খ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

❑ বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা

বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা

- জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়
- গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুশীলন বৃদ্ধি
- নির্বাহীদের কার্যভার লাঘব
- কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রশাসনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন
- লালফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস পায়
- প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পায়

বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে যুক্তি/অসুবিধা

- ব্যয় বৃদ্ধি:
- প্রশাসনের ঐক্য নষ্ট হয়
- জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতা
- প্রশাসনিক সমন্বয় বিঘ্ন হয়
- অধস্তনদের স্বেচ্ছাচারিতা

বিচার বিভাগ

❑ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ন্যায় নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সংগঠিত ও পরিচালিত। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। নিম্নে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো:

- পদসোপান ভিত্তিক কাঠামো
- সাংবিধানিক ভিত্তি
- পৃথকীকরণ
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
- দীর্ঘমেয়াদি চাকুরি
- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা

বিচার বিভাগ

❑ সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সরকারের শাসন বিভাগ থেকে পৃথক রাখার বিধান রয়েছে। এছাড়াও সংবিধানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক হিসেবে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শাসন ও আইন বিভাগ সংবিধান লঙ্ঘন করছে কি না তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব একমাত্র সুপ্রিমকোর্টের। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে কোনো আইন প্রণীত হলে তা বাধা দেওয়ার এখতিয়ার সুপ্রিমকোর্টের রয়েছে। তাছাড়াও জাতীয় সংসদ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করলে সেসব বাধা-নিষেধ যুক্তিসঙ্গত কি না তা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টকে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান।

বিচার বিভাগ

❑ সুপ্রিমকোর্ট গঠন

"বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট" বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট দুটি বিভাগ যথা (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত হবে। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং এর প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারপতির প্রয়োজন রয়েছে ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিয়োগদান করবেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের জন্য নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন এবং সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

বিচার বিভাগ

❑ বিচারক পদের যোগ্যতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

২. সুপ্রিমকোর্টে অন্যূন ১০ (দশ) বছরকাল এ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; অথবা

৩. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ১০ (দশ) বছরকাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে; অথবা

৪. অন্যূন ৩ (তিন) বছরকাল জেলা বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বলতে হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে বোঝায়।

❑ **হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার:** বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতাসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) আদি এখতিয়ার ও আপিল এখতিয়ার এবং (খ) অন্যান্য এখতিয়ার।

(ক) আদি ও আপিল এখতিয়ার: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত নাগরিক মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। তাছাড়াও যেকোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে–

১. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখতে অথবা আইনের দ্বারা করণীয় কাজ করার নির্দেশ দান করতে পারে।

২. প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে বা তার কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারবেন।

৩. কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয়েছে তবে আটক ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের সম্মুখে আনয়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। তাছাড়া কোনো সরকারি পদে আসীন কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদমর্যাদায় আসীন রয়েছেন তার প্রমাণ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

৪. হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অধস্তন আদালতে বিচারাধীন। মোকদ্দমায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের জটিল প্রশ্ন বা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ বিষয় জড়িত রয়েছে, তবে হাইকোর্ট বিভাগ তার অধস্তন আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে হাইকোর্ট বিভাগ নিজ এখতিয়ারে তুলে নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে হাইকোর্ট মামলাটি মীমাংসা করতে পারবেন অথবা ঐ অধস্তন আদালতে ফেরত পাঠাতে পারবেন।

(খ) অন্যান্য এখতিয়ার: হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তদারকি বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে।

❑ **আপিল বিভাগের এখতিয়ার:** সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের এখতিয়ারসমূহ নিম্নরূপ: (ক) আপিল সংক্রান্ত এখতিয়ার, (খ) উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার ও (গ) বিবিধ।

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

❑ সুপ্রিমকোর্টের পর্যালোচনা ক্ষমতা

সুপ্রিমকোর্ট বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাদাতা। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধি-বিধান সংবিধান বিরোধী কিংবা যুক্তিসঙ্গত কি না তা বিচার করার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের। সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট সে সব বিধি-বিধান সংবিধান বিরোধী হলে অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে। এটাই সুপ্রিমকোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) ক্ষমতা নামে অভিহিত। কেননা, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টকে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের (জাতীয় সংসদ) কার্যক্রমের ব্যাখ্যা ও বিচার করার ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান সর্বোচ্চ আইন এবং এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য অন্য কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়াও সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন প্রণীত হলে সে আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটি বাতিল হয়ে যাবে।" যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের মত বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টেও যথেষ্ট বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা বিদ্যমান।

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

❑ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।" কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হলে ট্রাইব্যুনালের আওতাধীন কোনো বিষয়ে অন্য কোনো আদালতে কোনোরূপ কার্যধারা গ্রহণ বা কোনো প্রকারের আদেশ প্রদান করবে। এমনকি ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে আপিল করা যাবে না। তবে জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারসমূহ নিম্নরূপ–

সংবিধানের ১১৭(১) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, অপসারণ, কর্মের মেয়াদ, দণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাদি;

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সংবিধানের ১১৭(১) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,

(২) কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি ব্যবস্থা;

সংবিধানের ১১৭(১) (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,

(৩) সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে সমস্ত বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ জারির কোনো ক্ষমতা নেই, সে সকল বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার থাকবে।

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

❑ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধি বিধান সাংবিধানিক। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী 'বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের' বিচারকদের নিয়োগ, আচার-আচরণ ও অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা যৌথভাবে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিচার বিভাগের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা শুধু রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তনের মাধ্যমে সামরিক সরকার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল এক সামরিক ফরমান (আদেশ) দ্বারা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে বিরাজমান রাষ্ট্রপতির একক ক্ষমতা বাতিল করেন এবং সেক্ষেত্রে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়।

❑ **গঠন:** সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি (আপিল বিভাগ) ও তার পরবর্তী দুজন সিনিয়র বিচারপতিকে নিয়ে এ কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়।

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

❑ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার একটি ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন:

(ক) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের আচরণ বিধি প্রণয়ন ও অসদাচরণের তদন্ত করবেন।

(খ) বিচারপতিদের বিষয়ে উল্লিখিত বিষয়ে তদন্ত এবং অপসারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

(গ) বিচারপতিদের অসমর্থ বা অসদাচরণের জন্য বিচারিক কার্যক্রমে অযোগ্য হলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রদান করতে পারবেন। তাহলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত বিচারককে অপসারণ করবেন।

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

❑ অধস্তন আদালতসমূহ

অধস্তন আদালত বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় আদালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। জেলা আদালতসমূহই অধস্তন আদালত। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের অধীনে জেলা পর্যায়ে ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচার পরিচালনার জন্য আদালত রয়েছে। এসব আদালতের বিচারক পদে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিচারক নিয়োগ প্রদান করেন। এর প্রথম নিয়োগকৃত পদের নাম 'সহকারী জজ'। নিয়োগ লাভের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক:

(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি;

(খ) সর্বোচ্চ বয়স বত্রিশ বছর।

বিচারিক সম্প্রসারণ: পঞ্চায়েত ও গ্রাম আদালত

❑ গ্রাম আদালত

বৃটিশদের আগমনের পূর্বে এদেশে পঞ্চায়েত নামে যে সংস্থা প্রচলিত ছিল তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল বিচারকার্য সম্পাদন ও ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা। বৃটিশরা যদিও প্রথমে এ দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার উপর অর্পণ করেনি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ১৯১৯ সালের পল্লি স্বায়ত্ব শাসন আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলার বিচার করার এখতিয়ার দেয়া হয়।

আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। এ দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শহরে গিয়ে দীর্ঘ দিন মামলা-মোকদ্দমা চালানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে যদি ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ও মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকে তাহলে তারা অনেক বিড়ম্বনা ও খরচের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। দ্রুত বিচার কার্যের ফলে ঝগড়া-বিবাদের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বহুলাংশে কমে যায় এবং তা গ্রামের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কয়েক বছর যদিও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় বিচার কার্য করার কোন ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু গ্রাম আদালত অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ এবং পরবর্তীতে ২০০৬ সালের গেজেট এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে পুনরায় বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিচার নিষ্পত্তিমূলক ও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যেই এ আদালত প্রবর্তন করা হয়েছে।

বিচারিক সম্প্রসারণ: পঞ্চায়েত ও গ্রাম আদালত

❑ গ্রাম আদালতের গঠন

একজন চেয়ারম্যান এবং বিবাদের প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্য নিয়ে মোট ৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্যের একজন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন।

❑ গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

(ক) গ্রাম আদালত অবমাননা বা সমন অস্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে জরিমানা বা জরিমানা অনাদায়ে জেল প্রদান করতে পারবে না। কিন্তু বিচারযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ সমূহের বিচারে কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে আদালত দোষী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ কোনো ভাবেই ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার ঊর্ধ্বে হবে না।

(খ) দেওয়ানি মামলার গ্রাম আদালত কোনো ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ অথবা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা তার দখল প্রত্যার্পণ করার আদেশ দিতে পারেন।

বিচারিক সম্প্রসারণ: পঞ্চায়েত ও গ্রাম আদালত

❑ গ্রাম আদালতের কার্যপদ্ধতি

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে বিবাদের যে কোনো পক্ষ বিচার চেয়ে গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট ৪.০০(চার) টাকা (দেওয়ানি মামলা হলে) অথবা ২.০০(দুই) টাকা (ফৌজদারি মামলা হলে) ফি দিয়ে আবেদন করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, কোনো অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আবেদন করা যাবে না। চেয়ারম্যান অভিযোগ অমূলক মনে করলে আবেদন নাকচ করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নাকচের কারণ লিখে আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরত দিতে হবে।

❑ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত

গ্রাম আদালতের রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে, যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তার অনুপাত রায়ে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। রায়ের পর ৪ নং ফরমে একটি ডিক্রি প্রস্তুত করতে হবে। গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত যদি সর্বসম্মত বা চার এক ভোটে গৃহীত হয় তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত পক্ষদ্বয়ের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনরূপ আপীল চলবে না। যদি তিন-দুই এ কোনো সিদ্ধান্ত হয় তবে সে সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে না। সিদ্ধান্ত ঘোষণার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে যে কোনো পক্ষ ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট (কগনিজেন্স আদালত) এবং দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে সহকারী জজ (মুন্সেফ) এর আদালতে আপিল করতে পারবেন। গ্রাম আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিক্রি বা ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের নির্দেশ দিবেন তবে তা ৬(ছয়) মাসের অধিক হবে না।

বিচারিক সম্প্রসারণ: পঞ্চায়েত ও গ্রাম আদালত

❑ গ্রাম আদালতের জরিমানা

গ্রাম আদালতের অবাধ্য হওয়া এবং অবমাননার অপরাধের জন্য গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। বিচারের স্বার্থে গ্রাম আদালতে যে কোনো ব্যক্তিকে হাজির হতে/সাক্ষ্য দিতে/দলিল দাখিল করতে/সমন দিতে পারে। আইন সঙ্গত অজুহাত ব্যতিরেকে সমন প্রাপ্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হতে বা রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নয় এমন দলিলাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে তাকে বক্তব্য পেশের সুযোগ দেবার পর সংশ্লিষ্ট আদালত উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা করতে পারেন।

❑ জরিমানা আদায়

আদালত অবমাননা বা সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার অপরাধে জরিমানা করা হলে জরিমানার অর্থ যদি পরিশোধ করা না হয় তাহলে গ্রাম আদালত তথ্য উল্লেখ করে একটি আদেশ লিখবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন। চেয়ারম্যান তা গ্রহণ করে উক্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর হিসাবে আদায় করবেন। আদায়কৃত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হবে।

বিচারিক সম্প্রসারণ: পঞ্চায়েত ও গ্রাম আদালত

❑ যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত বিচার করতে পারবে না

(ক) ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্বে অন্য কোনো আদালত কর্তৃক কোনো আদালত গ্রাহ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে;

(খ) দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে

(১) কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্বার্থ জড়িত থাকলে;

(২) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান কলহের ব্যাপারে কোনো সালিশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে;

(৩) মামলায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কার্যরত কোনো সরকারী কর্মচারি পক্ষ হয়ে থাকলে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

❑ প্রশাসন হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

প্রশাসন হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিধান রাখা হয়েছে। তাই ১৯৮৩ ও ১৯৯৩ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ সংশোধনের নিমিত্তে জোরালো কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। তবে সামরিক সরকারগুলোর আন্তরিকতার অভাবে এটি আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

অবশেষে ১৯৯৫ সালে মোঃ মাজদার হোসেন ও অন্য ৪৪০ জন বিচারক (সরকারি জজ, সাব জজ, অতিরিক্ত জজ, জেলা জজ) বাংলাদেশ সরকারকে বিবাদী করে ২৪২৪ নং রিট মামলাটি (সিভিল) দায়ের করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। উক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের ১২ দফা নির্দেশনার আলোকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য সর্বশেষ ২০০৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি শেষ করে। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ ৩৬ বছরের সাংবিধানিক বিধি বিধান বাস্তবে কার্যকরী রূপ লাভ করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

❑ বিচারিক নিরপেক্ষতার নিয়ামক

কোনো রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার সাথে বিচারকগণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য বিচারকদের কর্মব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা পালন সে রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আর বিচার বিভাগের দক্ষতার উপর নির্ভর করে সরকারের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা ও যোগ্যতা। বিচারকদের নিরপেক্ষতা ছাড়া ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। বিচারকদের নিরপেক্ষতা কতগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে বিচারকদের নিরপেক্ষতা রক্ষার শর্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

(ক) বিচার ব্যবস্থা: সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। কেননা, বিচার ব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের প্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই বিচারকার্য পরিচালনার মৌলিক লক্ষ্য। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ছাড়া নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। কোনো দেশের শাসন কাঠামো যথার্থভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তার নির্ধারক হলো সে দেশের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা। কেননা, বিচার বিভাগের দক্ষতার মাধ্যমেই সরকারের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা ও উৎকর্ষতা যাচাই করা যায়। রাষ্ট্রে ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দক্ষ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা সুসংগঠিত ও পরিচালিত।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিচারকদের নিরপেক্ষতার অন্যতম শর্ত হলো বিচারকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা। বিচারকরা যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হন, আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ না হন তাহলে তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। এজন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা, শিক্ষাগত যোগ্যতা উত্তম বিচার ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

(গ) মেধা: উত্তম বিচার ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো মেধাজ্ঞান। কেননা, বিচারকগণ উত্তম মেধাজ্ঞানের অধিকারী না হলে তাদের নিকট থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা কল্পনাতীত। এজন্য বিচারকগণের আইনের জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবেই বিচারকগণ বিচার-বিবেচনাপ্রসূত জ্ঞান, মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন।

(ঘ) প্রশিক্ষণ: বিচারকদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। কেননা, প্রশিক্ষণই বিচারকদের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। এজন্য বিচারকদের দক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চাকুরির পূর্বে ও চাকুরিকালীন ধারাবাহিকভাবে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এজন্য যে, প্রশিক্ষণ একজন বিচারককে নিখুঁত করে গড়ে তোলে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

(ঙ) অভিজ্ঞতা ও সততা: বিচারকদের অভিজ্ঞতা ও সততার উপর ন্যায়বিচার অনেকাংশে নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতা ও সততা ছাড়া বিচারকদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করা যায় না। কেননা, বিচারকগণ যদি অভিজ্ঞ না হন তবে বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সঠিক রায় প্রদান করতে পারবেন না। প্রাতিষ্ঠানিক ও ন্যায় ভিত্তিক বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা ও সততার উপর ভিত্তি করে বিচারকদের নিয়োগ দিতে হবে। তাকেই বিচারকগণ ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে ন্যায়-নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবেন। অন্যদিকে আইনজীবীদেরও অভিজ্ঞ ও সৎ হওয়া আবশ্যক। কেননা, কোনো জটিল মামলায় অনভিজ্ঞ আইনজীবী নিযুক্ত হলে সুষ্ঠু বিচারকার্য সম্পাদন ব্যাহত হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

❑ বিচারকদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা

দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সমাজজীবনে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম মানদণ্ড। বিচারকদের যেমন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়, ঠিক তেমনি তাদেরকে আবার জবাবদিহিও করতে হয়। কেননা, বিচারকগণ যদি দায়িত্বশীলতার সাথে বিচারকার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন তাহলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে না। বিচারকগণকে তাই সকল প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে, লোভ-লালসা পরিহার করে যথাযথভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা বাঞ্ছনীয়।

কেননা, বিচারকগণ দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলে সমাজ ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দিতে বাধ্য। এজন্য "শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন" নীতি যাতে অনুসরণ করা হয় সেজন্য বিচারকগণকে দায়িত্বশীল হতে হবে। আবার বিচারকগণকে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিচারকগণ সমাজের নিকট জবাবদিহিতার সূত্রে আবদ্ধ। দায়িত্বে অবহেলা বা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে তাদেরকে অবশ্যই জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তবেই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

❑ জনসার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার আঁধার। জনসার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সার্বভৌমত্ব শব্দটির অর্থ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ল্যাটিন শব্দ Superanus থেকে ইংরেজি Sovereign বা সার্বভৌমত্ব শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ, সর্বোচ্চ ও সীমাহীন ক্ষমতাকে বোঝায়।

ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Jean Bodin সর্বপ্রথম ১৫৭৩ সালে সার্বভৌমত্ব কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে "সার্বভৌমত্ব হচ্ছে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিক ও প্রজাগণের উপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, যার উপর কোনো আইনগত বাধা নিষেধ নেই।" এই উক্তির মাধ্যমে তিনি জনগণের উপর রাষ্ট্রের আরোপিত ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, কেননা, জনগণের প্রতিনিধিরাই সরকার গঠন করে। এজন্য জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। সরকার কেবল জনগণের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, জনগণ সরকার, সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অন্যায়ভাবে শোষণের ও নির্যাতনের শিকার হন। এসব শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন বিচার বিভাগ। কেননা, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। আমাদের দেশের বিচারকগণ শাসন বিভাগের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ বিচারকগণ অনির্বাচিত। তারা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এ কারণেই জনগণের সাথে বিচার বিভাগের বিচারকদের তেমন কোনো যোগসূত্র গড়ে উঠে না। কিন্তু বিচারকগণ যদিও জনগণ থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করেন তথাপিও বিচারকগণ পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন। এজন্য যে, বিচার বিভাগের বিচারকগণ রাষ্ট্রের সংবিধানের ঊর্ধ্বে নন বরং সংবিধানের অধীন। সংবিধান আবার জনগণের প্রতিনিধি তথা আইনসভা দ্বারা রচিত। এছাড়া সংবিধানের অধীনেই বিচারকগণের নিয়োগ, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা, পদচ্যুতি ইত্যাদি নির্ভর করে। সংবিধান যেহেতু আইনসভা দ্বারা রচিত এবং জনসার্বভৌমত্বের দলিল সেহেতু বিচারকগণ জনসার্বভৌমত্ব বিচ্ছিন্ন নয়। বরং জনসার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগ পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

❑ **বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) তত্ত্বসমূহ:** বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি বা ADR বিচার বিভাগ বহির্ভূত (out of court) হোক বা অন্তর্ভুক্ত হোক তিন ধরনের theory বা তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

১. আলাপ আলোচনা (Negotiation)
২. মধ্যস্ততা কার্যক্রম (Mediation or Conciliation)
৩. সালিস ব্যবস্থা (Arbitration)

➲ বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই তিনটি তত্ত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে তা হল আদালত ব্যবস্থার বিপরীতে তথা আদালতের বাহিরে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা।

১. আলাপ আলোচনা (Negotiation): সাধারণ আলাপ আলোচনায় কোন তৃতীয় পক্ষ থাকে না। বিরোধের দুপক্ষই একত্রে বসে নিজেদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করাকে আলাপ আলোচনা বলে। যদি পক্ষগণ আলোচনার পর নিষ্পত্তিতে উপনীত হয় তাহলে উক্ত নিষ্পত্তি নামায় উভয়পক্ষ দস্তখত করে বিরোধের ইতি টানবে।

২. মধ্যস্ততা কার্যক্রম (Mediation or Conciliation): মধ্যস্থতা কার্যক্রম বিরোধ পক্ষদ্বয়ের মাঝে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ বিরোধ মীমাংসায় সহযোগিতা করে। দেওয়ানী কার্যবিধি ৮৯ (ক) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, দেওয়ানী মামলার লিখিত জবাব দাখিলের পর উভয়পক্ষের বা তাদের আইনজীবীদের উপস্থিতিতে মামলার শুনানী স্থগিত রেখে আদালত-

ক. নিজেই পক্ষদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারে অথবা
খ. পক্ষগণ কর্তৃক নিযুক্ত কোন আইনজীবীর নিকট প্রেরণ করতে পারে অথবা

গ. উপ-ধারা (১০) অনুসারে জেলা জজ্ কর্তৃক নির্ধারিত প্যানেলের কোন মধ্যস্ততাকারীর নিকট প্রেরণ করতে পারে।

➲ **Conciliation:** বস্তুতপক্ষে meditation এবং Conciliation মাঝে তেমন বস্তুগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু নামে। Mediation পরিচালনা করে একজন mediation বা মধ্যস্থতাকারী; অন্যদিকে Conciliation যিনি পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় conciliator। আমাদের দেশে শ্রম আইন ২০০৬ এর ২১০ ধারায় conciliation তথা মধ্যস্থতা কার্যক্রমের বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. সালিস ব্যবস্থা (Arbitration): মধ্যস্থতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতকারী পক্ষদ্বয়কে বাধ্যকর কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। অন্যদিকে সালিস কার্যক্রমে সালিসকারী পক্ষগণের উপর বাধ্যকর রায় প্রদান করতে পারে এবং উক্ত রায়কে বলা হয় Award বা রোয়েদাদ। সালিস কার্যক্রমে ২০০১ সালের সালিস আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

❑ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সুবিধাসমূহ

১. স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থার জটিলতা থেকে বিকল্প পদ্ধতি মানুষকে মুক্তি দেয়। আধুনিক দেওয়ানী বিচার বাবস্থায় বিরোধ মীমাংসা কার্যক্রম অনেক জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। ফলে বিচার প্রার্থীদের বিচার পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় অথচ বিকল্প পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠিকভাবে অতি অল্প সময় এবং সহজে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

২. বিকল্প পদ্ধতিতে মানুষের সময় এবং অর্থের মূল্যায়ন করে এবং অর্থের অপচয় রোধ করে। এ কারণে বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি অনেকটা মানসিক তৃপ্তির খোরাক জোগায়।

৩. স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তথা দেওয়ানী আদালত ব্যবস্থার বেশির ভাগই দ্বান্দ্বিক এবং ইহা ক্রমেই মানুষকে মামলার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি মানুষকে সহমর্মী এবং সমঝোতাপূর্ণ হতে শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে পারিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

❑ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির অসুবিধাসমূহ-

প্রথমত: বিকল্প বিরোধ সহজে এবং কম খরচে মামলার নিষ্পত্তি করলেও অনেক সময় ইহা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে না।

দ্বিতীয়ত: কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন, শ্রেণিগত বৈষম্য (systematic injustice) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধকে অনেকেই ন্যয় সঙ্গত মনে করেন না।

তৃতীয়ত: অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ পদ্ধতি আইনের শাসনের (rule of law) পরিপন্থী। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক বিকল্প বিরোধ (যেমনঃ বাংলাদেশের গ্রাম্য সালিস প্রথা) ধনী প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত হয় না।

চতুর্থত: বিকল্প বিরোধ পদ্ধতি কোন নজিরের জন্ম দেয় না। কারণ ইহা কোন আইনগত প্রশ্নের যথাযথ এবং বিচারিক পন্থায় ব্যাখ্যাসহ সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

পঞ্চমত: অসম ক্ষমতার পক্ষদ্বয়ের (in the context of extreme power imbalance between the parties) মাঝে সাধারণত বিকল্প বিরোধ ভাল ফলাফল দেয় না।

❑ **কোন ধরনের মামলা ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির উপযুক্ত নয়:** যে সকল মামলা কেবল ঘোষণামূলক সেসব মামলার ক্ষেত্রে ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি উপযুক্ত নয়। যেমন: সাংবিধানিক বা আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত মামলা বিশেষ করে রীট (Writ) জাতীয় মামলাসমূহ ADR ব্যবস্থায় নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। একইভাবে, ফৌজদারী মামলায় খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, অস্ত্র দুর্নীতি ইত্যাদি ধরনের মামলা ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।

❑ **যে সকল মামলা ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি উপযুক্ত:** ক্ষতিপূরণের মামলা, পারিবারিক আদলতের মামলাসমূহ, অর্থ ঋণ আইনের বা অন্যান্য টাকার মামলা। ছোট ছোট ফৌজদারী মামলা যেমনঃ চুরি, ছিনতাই আক্রমণ বা স্বাভাবিক আঘাত ইত্যাদি।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

❑ **বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ADR ব্যবস্থা কতখানি গ্রহণযোগ্য:** বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। ছোট এই দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি যা উহার আয়তনের তুলনায় অস্বাভাবিক। এই প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রতি লাখ মানুষের জন্য বিচারকদের সংখ্যা মাত্র ১ জন। আরও সমস্যা হল এই বিচারকদের একটি বড় অংশ নবীন বিচারক যাদের বিচার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম। ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম দেওয়ানী কার্যবিধিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান সংযোজন করা হয়। কিন্তু এই ১৮ বছরে অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যাতো কমেই নি বরং অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। তবে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং অনিষ্পন্ন মামলার ভয়াবহ চিত্র থেকে কোন বিকল্প নেই। সম্প্রতি যদিও সংসদে আইন পাশ করে ADR বাবস্থা গ্রহণ করা প্রতিটি দেওয়ানী মামলায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কিন্তু এখনও ইহা মামলার আয়ুকে দীর্ঘায়িত করবে মাত্র, কোন সুফল বয়ে আনার সম্ভাবনা কম। তার মূল কারণগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

১. মধ্যস্থতার পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের কোন কার্যকর ক্ষমতা আদালতের নেই। আদালত মামলা মীমাংসার জন্য পাঠালেন কিন্তু দেখা গেল এক পক্ষ উপস্থিত হল এবং অন্য পক্ষ মধ্যস্থতায় উপস্থিত হল না। অনুপস্থিত পক্ষের উপর আইনগত কোন ব্যবস্থা দণ্ড বা জরিমানা আরোপের বিধান আদালতকে দেয়া হয় নি।

২. ৮৯ (ক) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, লিখিত জবাব দাখিলের পর উভয়পক্ষ যখন আদালতে উপস্থিত থাকবে তখন আদালত মামলার শুনানী মুলতবি রেখে মধ্যস্থতার জন্য পাঠাবে। কিন্তু বাস্তবতা হল এই যে, উভয় পক্ষ সাধারণত খুব কমই একত্রে আদালতে উপস্থিত হয়। এরূপক্ষেত্রে আদালতের কি করণীয় তার কোন বিধান করা হয় নি।

৩. আবার দেখা গেল, উভয়পক্ষ মধ্যস্ততায় উপস্থিত হল কিন্তু এক পক্ষ যথাযথ কারণ ব্যতীত মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত মেনে নিল না। এরূপ ক্ষেত্রেও আদালতকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- সংসদে নারী আসন সংরক্ষিত রাখা কতটা যৌক্তিক? [৩৮তম, ২৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কাঠামো তুলে ধরুন। [৩৬তম বিসিএস]
- আইন এবং অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য। [৩৬তম বিসিএস]
- সংসদীয় সরকার কীভাবে গঠিত হয়? [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতার একটি বিবরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের আইন পরিষদের গঠন সম্পর্কে লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় Rules of Procedure-এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের গঠন সম্পর্কে লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ ধারায় আপনি কী ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করবেন? [৩৫তম বিসিএস]
- জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা উল্লেখ করুন। [৩৪তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy